খুনের সংখ্যা এক

কবিতা সিংহ

১৩৫৮

রাসবেহারী এভিনিউ ধরে সোজা দক্ষিণ দিকে হেঁটে যাচ্ছিল ত্রিদিব। এভাবেই সে হেঁটে আসছে এস্প্ল্যানেড্ থেকে।

রোজ যেমন ভোরবেলা ময়দানে হাওয়া খেতে আসে আজও তেমন এসেছিল। কিন্তু ময়দানের কুয়াশামাখা নির্জনতায় তার বুকের ভিতরে গুমরে ওঠা ভয়গুলো এত মাথা চাড়া দিয়ে উঠল যে ত্রিদিব আর টিক্‌তে পারল না। ময়দান থেকে পালিয়ে এল।

আজকাল ত্রিদিব আর নিজে ড্রাইভ করে না। কারণ দু'টো। প্রথমতঃ তার হাত কাঁপে। দ্বিতীয়তঃ সে সর্বদাই তার কাজের কিছু সাক্ষী রাখতে চায়। তবু তাকে আজ কেমন একটা পাগ্‌লামিতে ভর করল। সে শোফার আর গাড়ি ছেড়ে দিয়ে হাঁটতে শুরু করলো। সিধে দক্ষিণ দিকে। যেন একটা পুরোনো অভ্যেস অনেকদিন বাদে তাকে একটা পুরোনো নেশার মত কব্জা করেছে।

ত্রিদিবের বাহান্ন ইঞ্চি শান্তিপুরী ধুতীর জরিপাড় কোঁচাটা তখনো অনাদরে শিশির লাগা ফুটপাথের আর্দ্র ঘাসে কিম্বা কাদাটে ধুলোয় ঘষটে ঘষটে যেমন ইচ্ছে ধুলো মাখছিল। কিন্তু ত্রিদিব সেদিকে লক্ষ্য করছিল না। আর নেহাতই কলকাতা শহরে চলাফেরা করার অভ্যেসটা তাকে তখনো ছাড়ে নি ব'লে লাইটপোস্টে বা পথচল্‌তি মানুষের সঙ্গে তার ধাক্কা লাগছিল না।

হাঁটতে হাঁটতে দেশপ্রিয় পার্কের কাছে এসে তার যেন সম্বিত ফিরে এল। এই রকম মানসিক অবস্থা নিয়ে ঠিক এই মুহূর্তে সে কোথায় যাবে?

রায়বাড়ি?

পুলিশ স্টেশন?

না ট্রেনের তলায় ?
হঠাৎ ওপারের ফুটপাথে একগুচ্ছ চেনা চেনা মুখ চোখে পড়ল ত্রিদিবের। কতদিন পরে 'সুরুচির' সাইনবোর্ডটা দেখতে পেল সে।
কতদিন ত্রিদিব 'সুরুচি'তে যায় নি। তা প্রায় এক বছরেরও বেশি হয়ে গেল।
যায় নি ত—যায় নি! তা'ব'লে কেউ কি তার কথা ভেবেছে ? যাদের সে বন্ধু বলত। সেই সব সমবয়সী বন্ধু, সঙ্গী আর পরিচিতদের কথা মনে পড়তেই নিঃসঙ্গতার বেদনাটা ত্রিদিবের ভিতর আরো বেশি রিন্‌রিন্‌ করে উঠল।
'সুরুচি'তে রবিবার বা ছুটির দিন যারা আসর জমাতে যায় তারা লেখক কবি কিম্বা ছবি আঁকিয়ে। একটু ভেবে দেখল ত্রিদিব। নাঃ আরো নানান ধরনের ছোক্‌রারা যায়। সিনেমা লাইন আর গানের লাইনের উঠ্‌তি প্রতিভারাও যায়। সব বাউণ্ডুলের দল। নিজেদেরও কোনো ঠিক্‌ ঠিকানা নেই, অন্যদেরও কোনো খোঁজ খবর রাখে না ওরা। তুমি পাশে গিয়ে বোসো। মুড্‌ থাকলে চেয়ার টেনে বসাবে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্পগাছা করবে। যেন সাতজন্মের চেনা। তারপর উঠে যাও, তিনমাস এসো না, কারো মনেও পড়বে না তোমাকে।
ত্রিদিব নিজের মনেই হাসল।
—দূর—বন্ধু না ছাই সব।
নেহাতই সময় কাটাবার সঙ্গী। আজকের এই অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থায় কিন্তু ত্রিদিবের সময়োচিত নয়, এমনি সব অদ্ভুত কাজ করতে ইচ্ছে করছিল। সে নিজের সঙ্গে যেন নিজেই একটা বাজি ফেলল। নিজেই নিজেকে বলল, দেখাই যাক না একবার পরখ করে।
একবছর আগে এই 'সুরুচি'তে কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে বসে, যাদের সঙ্গে কাপে আর সসারে ভাগাভাগি করে চা খেত আর রাজা উজির মারত ত্রিদিব, তাদের মধ্যে কেউ তাকে ঠিকমত বুঝতে পারে কিনা, এটা

ত্রিদিব, আজ পরখ করে দেখে নিতে চায়।

তাই রাস্তা ক্রশ কবে ত্রিদিব 'সুরুচি'র দিকে হাঁটা দিল।

'সুরুচি'র দরজার ফ্রেমে দুদিকে দুহাত রেখে দাঁড়াতেই রবিবারের টইটুম্বুর ভিড়, সিগারেটেব কড়া ধোঁয়া আর এক ঝলক গরম ত্রিদিবের গায়ে পায়ে ঝপাৎ কবে আছড়ে পড়ল। ভিড়ে চোখ তুলে তাকাল, বিব্রত আশ্চর্য নির্বিকাব কৌতূহলী একবাশ চোখ, তাবপর যে যার চোখ নামাল। ওবই মধ্যে দু-একজন খানিকটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ওর উৎকৃষ্ট পোষাকের দিকেও তাকিয়ে নিল কয়েক বার। চাবপাশের ভুষোকালি কিম্বা ওরই কাছাকাছি বঙেব ব্লাউজ শার্ট আর প্যান্টের ভিড়ে ত্রিদিবের দবাজ মটকাব পাঞ্জাবী, ব-সিল্কেব জহব কোট আব জরিপাড় শান্তিপুরী ধুতি যেন একটা বিপ্লবেব মত।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ত্রিদিব যখন কোনো টেবিল থেকে ডাক পাওয়ার আশা ছেড়ে দিয়ে, হতাশ হয়ে ফিবে যাবে ভাবছে, তখনই কে যেন ত্রিদিবকে ডাকল।

ওঃ হোঃ, ওইত 'ইদানীং' পত্রিকাব গ্রুপ্। ত্রিদিব ওদের খোপের দিকে এগোল। ফ্ল্যাট্ বাড়ির বাথরুমেব চেয়েও ছোট্ট একটা খোপের মধ্যে, অতি ছোট একটি টেবিলেব দুপাশে দুটি ক্ষুদ্রকায় বেঞ্চিতে বেশ জাঁকিয়ে চার পাঁচজন ছেলে বসে আছে। চঞ্চল, দীপেন, প্রতাপ আর শিশির। কোণের দিকে বসে আছে শিশির। একটা টুল টেনে বসতে না বসতেই প্রশ্নের ঝাপ্টা।

হঠাৎ এই পোষাকে যে?

—এ্যাদ্দিন কোথায় ছিলে হে?

—আরে ভোল টোল একেবারে পাল্টে ফেলেছ যে?

—লটারিতে টাকা পেয়েছ নাকি?

ত্রিদিব মনে মনে ভাবলে বলতে পারে ওরা। ওদের কোনো দোষ নেই কারণ দেড় বছর আগে হ্যাণ্ড্লুমের দুখানা শার্ট আর খাকি প্যাণ্ট্ ছাড়া

আর কিছুই ছিল না ত্রিদিবের। এমনকি রোজ দাড়ি পর্যন্ত কামাত না ত্রিদিব। চুল কাটত ছোট ছোট করে। 'সুরুচি'তে এসে পরের পয়সায় চা খেত। মেসে কি কষ্ট করে সিঙ্গল খাটিয়ায় শুয়ে থাকত।

কিন্তু তখন, দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ত্রিদিব ভাবল, এখন যে দুশ্চিন্তাটা থেকে থেকে তার বুকের ভিতর ঘুরপাক খাচ্ছে সেটা ত ছিল না। ত্রিদিব কি বিষম শান্তিতে ছিল।

বিয়ে করেছ? দেখতে কিন্তু দিব্যি লাগছে তোমায়।

ত্রিদিব মনে মনে ভাবলে, হ্যাঁ, বিয়ের কথাও বলতে পারে ওরা। কালই কি একটা ইংরেজি নভেল উল্টোতে উল্টোতে একটা লাইন চোখে পড়েছিল তার। উঠে গিয়ে তার ঘরের দামী বেলজিয়াম আয়নায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজেকে দেখে চাপা হেসেছিল ত্রিদিব। নিজের প্রতিবিম্বকে বলেছিল,

'সত্যি কথা। ত্রিদিব ভালোবেসে তুমি কিন্তু আগের চেয়ে অনেক সুন্দর হয়ে গেছ।

ডুব দিয়েছিলে কোথায় বলতো?

ত্রিদিব আবার মনে মনে কথা বলতে শুরু করল।

—হ্যাঁ, এ প্রশ্নও করতে পারে ওরা। সত্যি কতদিন 'সুরুচি'তে আসতে পারে নি সে। দক্ষিণ কলকাতার বাসই উঠে গেছে তার কবে। তারপর গত ছ'সাত মাস ধরে পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে সে সুমিতাদের সঙ্গে। কলকাতা থেকে কাশ্মীর, কাশ্মীর থেকে দার্জিলিং, দার্জিলিং থেকে পুরি ঘোরার কোনো মাথামুণ্ডু নেই। সুমিতা যখন যা বলছে তখন তাই। আর তার আগে? তার আগের এক বছরে তার সারা জীবনটাই আমূল পাল্টে গেল। কত সব নতুন নতুন মানুষ এল তার জীবনে। কত নতুন পরিবেশ আর পরিস্থিতি। কাকাবাবু, রানী পিসিমা, সুমিতা, নিভা আর সরল। কতদিন কতবছর একা একা বোর্ডিঙে আর মেসে কাটিয়েছে ত্রিদিব। এতদিন বাদে আবার সংসারের স্বাদ। ঘরোয়া মিষ্টি

পরিবেশ। ত্রিদিবের গলার কাছটায় অদ্ভুত একটা কান্না ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

ছোটবেলা থেকেই বোর্ডিঙের নিঃসঙ্গ বিকেলের টানা লম্বা, মনকেমন করা ছায়ায় বসে বসে ত্রিদিব এই সব অসম্ভবের স্বপ্ন দেখত। বেশ কেমন স্কুল থেকে ফিরে আসবে সে। ঝাঁপিয়ে পড়বে মায়ের ঠাণ্ডা কোলটিতে। মা আদর করে তাকে খেতে দেবেন। তারপর বাবা আসবেন অফিস থেকে। বাবার কোলের কাছটিতে বসে পড়া করবে। আরো কত কি? কিন্তু সে সুখ তার ভাগ্যে নেই,—থাকলে এত কম-দিনের মধ্যে সেই সুখ সে পেয়েও হারায় কি করে? সে মনে মনে ভাবতে লাগল, ওরা সব বলতে পারে। যা খুশি বলতে পারে। এখন এসব স্পেকুলেশনে ওর আর বিশেষ কিছু যায় আসে না। কারণ এর চেয়ে আরো অনেক নির্মম কতকগুলো চিন্তা ওর সমস্ত স্বস্তিকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

কিন্তু ত্রিদিব কোনো কথারই উত্তর দিতে পারছিল না। সে শুধু দিশে-হারার মত তাদের দিকে তাকিয়েছিল। বন্ধুরা খানিকক্ষণ জিজ্ঞাসু হয়ে তাকিয়ে রইল উত্তরের প্রত্যাশায়, তারপর আবার যে যার পুরোনো আলোচনায় ফিরে গেল। কে এই ত্রিদিব? কেনই বা সে এক বছর আসে নি? সে বিয়ে করেছে কিনা। এর চেয়ে অনেক সিরিয়াস আর মোক্ষম সব ব্যপার ঘটে যাচ্ছে সাহিত্যজগতে। কে কাকে ল্যাং মেরেছে, কে কার লেখা টুকলিফাই করে চালিয়ে দিয়েছে, কিম্বা কে রাজার মত কবিতা লিখছে। ত্রিদিবকে এসব প্রশ্ন নেহাত শুকনো ভদ্রতাবোধে জিজ্ঞাসা করা। নেহাতই সৌজন্যের খাতিরে।

তবু ওদের পাশটিতে অবজ্ঞাত হয়ে বসে থাকতেও ত্রিদিবের বিষম ভালো লাগছিল।

এখানে ভিড়ে, গোলমালে, গরম চায়ের তাজা গন্ধে, কবিতা গল্প নিয়ে তর্কের সরগরম আবহাওয়ার উত্তেজনা পোয়ানো রোদের মত আস্তে

আস্তে নিজের ভিতরে গ্রহণ করতে করতে ত্রিদিব বোকার মত ভাবল কোন ভাবেও যদি এই মাঝের দেড় বছরের জীবনটাকে মিথ্যে স্বপ্ন করে উড়িয়ে দেওয়া যেত।

দরজা দিয়ে রাস্তার ওপারে শীতের সোনালী রদ্দুরে স্নান করা দুটি প্রেম-মুগ্ধ ছেলেমেয়ের দিকে তাকিয়ে ত্রিদিব একটা সিগারেট ধরালো।

হঠাৎ সুমিতার কথা মনে পড়ে গেল তার। সুমিতার সঙ্গে যদি এভাবে জড়িয়ে না পড়ত ত্রিদিব তাহলে আগের জীবনে ফিরে যাওয়া তার পক্ষে খুব একটা কঠিন হয়ে পড়ত না। কিন্তু সুমিতার জন্যই ...

খানিকক্ষণ বাদে বেয়ারা টাকা ফেরৎ আনতে ত্রিদিবের খেয়াল হ'ল সে একটা একশোটাকার নোট বের করে চায়েব দাম চুকিয়ে দিয়েছিল। খোপের সবাই বোধ হয় সেইজন্যেই কেমন অদ্ভুত চোখে তার দিকে চাইতে চাইতে বেরিয়ে গেল। যেন সে খুব একটা দোষ করে ফেলেছে। ত্রিদিব মনমরা হয়ে ফির্তি নোটগুলো যখন তার নোটকেশে ভরতে গেল, তখনি তার চোখাচোখি হয়ে গেল শিশিরের সঙ্গে। শিশির ধোঁয়াটে অন্ধকার দেয়ালের সঙ্গে প্রায় মিশে গিয়েই বসেছিল। চুপ চাপ ছিল বলে এতক্ষণ ত্রিদিব শিশিরের পুরো অস্তিত্বটাই ভুলে গিয়েছিল, এখন নড়ে চড়ে বসতে ত্রিদিব টের পেল।

শিশির বেশি কথাবার্তা বলতে পারে না কোনো দিনই। আজও বলে নি। কিন্তু ত্রিদিবের মনে পড়ল একমাত্র শিশিরের সঙ্গেই সে মাঝেমাঝে অনেকদূর একসঙ্গে হেঁটে বাড়ি গিয়েছে। একমাত্র শিশিরই তার অনেক ব্যক্তিগত কথা জানে। ওরা কিছুদিন একসঙ্গে থেকেছে, আজও ত সবাই যখন যার যার নিজের ধান্দায় চলে গেল তখন একমাত্র শিশিরই বা কেন চুপ্‌চাপ্‌ বসে রইল ? গেল না। ত্রিদিবের মনে সান্ত্বনার সামান্য একটু প্রলেপ পড়ল যেন।

শিশির ওর দামী লেদারের নোট কেশটার দিকে চোখ রেখে বললে, হঠাৎ একশো টাকার নোট ?

ত্রিদিব একটু অপ্রস্তুত হেসে বললে,—ওঃ কি জানো শিশির, ওরা সবাই বোধহয় ভাবল আমি লোক দেখিয়ে একশ টাকার নোট ভাঙালাম। কিন্তু আসল ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। মাসের প্রথমে হাত খরচের জন্য যে টাকা পাই, তা আমার খরচাই হয় না। ভাঙানোর কোনো দরকারই হয় না। তাই ···

শিশির ঠাণ্ডা গলায় বলল, বসোনা ত্রিদিব।

ত্রিদিব সেই আমন্ত্রণের সুর ঠেলতে পারল না। আবার ধপ্ করে বসে পড়ল। শিশির তখন খুব আস্তে আস্তে সিগারেটের প্যাকেটটা খুলল। তারপর যেন অনন্তকাল ধরে প্যাকেট্ থেকে একটা সিগারেট বের করল। তারপর যেন শ্লো-মোশানে ছবি দেখানো হচ্ছে এইভাবে ধীরে ধীরে সিগারেট্টা ধরালো। ত্রিদিব দেখল আস্তে আস্তে সিগারেটের সূক্ষ্ম নীল ধোঁয়াগুলো অদ্ভুত সব আকৃতি বিস্তার করে হলঘরের ধোঁয়ায় মিশে যাচ্ছে।

শিশিরকে নিয়ে এই ই মুস্কিল। সে যখন কথা বলবে না মনস্থ করে তখন কেউ তাকে কথাও বলাতে পারবে না। নড়াতে চড়াতেও পারবে না। শিশির নেহাতই আর পাঁচজন বাঙালী যুবকের মত। শ্যাম্লা রং। মুখের রেখাগুলি একটু তীক্ষ্ণ। কালোফ্রেমের চশমার তলায় চোখ দু'টি উজ্জ্বল আর হাসিমাখা। তবে যেহেতু ত্রিদিব জানে শিশির কবি, সেহেতু ত্রিদিব যেন শিশিরের মধ্যে আরও অতিরিক্ত একটি মাধুর্য নিজে থেকেই আবিষ্কার করে নিয়েছে। শিশির স্বভাবতই চুপচাপ অথচ সঙ্গীর সম্বন্ধে কৌতূহলী থাকে বলেই তার কাছে সঙ্গীরাই সব সময় পঞ্চমুখ।

তাই খানিকক্ষণ বাদে ত্রিদিব সবিস্ময়ে টের পেল যে বন্ধুরা এতক্ষণ তাকে যে সব প্রশ্ন করছিল সে সমস্ত প্রশ্নের উত্তরই সে নিজের থেকেই শিশিরকে দিয়ে যাচ্ছে।

শিশির বিনা বাক্যব্যয়ে ত্রিদিবের কথাগুলো শুনে যাচ্ছিল। কোনো উত্তর করছিল না।

তারপর ত্রিদিবের সব কথা ফুরোলো শিশির ধীরে ধীরে প্রশ্ন করল।
—আচ্ছা ত্রিদিব এখানকারই কারা যেন বলছিল তুমি নাকি দার্জিলিঙে গিয়েছিলে। হ্যাঁ হ্যা মনে পড়েছে, বোধ হয় শ্যামলরাই বলে থাকবে। ওরা আঁকতে গিয়েছিল দার্জিলিঙে। সেখানে তোমাকে দেখেছে।
ত্রিদিব চম্‌কে উঠল। আজকাল সাধারণ কথাবার্তা ঘটনা তার মনে থাকে না। তা মনে করতেও তার মনের মধ্যে ডুবুরি নামাতে হয়। হ্যাঁ এবার মনে পড়েছে তার। দার্জিলিং স্টেশনে শ্যামলদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তার।
শিশির ইতিমধ্যে আর এককাপ করে চায়ের অর্ডার দিয়েছে। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে ছমাস আগের দার্জিলিং স্টেশনে ফিরে গেল ত্রিদিব। আবছা কুয়াশায় স্টেশনের প্ল্যাট্‌ফরমটা ভরে আছে। স্টেশনের আলোগুলো কুয়াশার ঘেরাটোপে লাল্‌চে আর জ্যোতিহীন হয়ে জ্বলছে। ওরা সেদিনই ফিরে যাচ্ছিল দার্জিলিং থেকে। সুমিতা আর একদিন একমুহূর্তও জলাপাহাড়ে থাকতে চায় নি। শক্‌টা কাটাবার জন্য তবু দু'চারদিন অপেক্ষা করেছিল ওরা। তবে সুমিতাকে সব সময়েই চোখে চোখে রাখতে হ'ত।
সুমিতা একা বসেছিল একটা হোল্ডঅলের ওপর। সরল রানী পিসীমা আর নিভা স্টলে চা খেতে গিয়েছিল। একটু দূরে। ঠিক তখনই শ্যামল আর ত্রিদিবের একেবারে মুখোমুখি দেখা।
—আরে ত্রিদিব তুই, তুই যে হঠাৎ এখানে?
—তোরা?
—আমরা, নিজের রঙ তুলি ক্যানভাসের রাশ দেখিয়ে শ্যামলরা বলেছিল—দার্জিলিঙের পাহাড় আর কুয়াশা আঁকতে এসেছি। এখান থেকে কার্শিয়াং যাবো, তারপর কলকাতা। কিন্তু তুই, তুই না রিসার্চ এ্যাসিস্ট্যাণ্টের একটা চাকরি করছিলি কলকাতায়? এখানে কি বদলি?
ত্রিদিব শ্যামলদের গাড়ি ভারি ওভারকোট আর রঙ তুলির বাক্সর দিকে

তাকিয়ে বলেছিল,

—বাঃ বেশ আছিস কিন্তু তোরা।

— তুই-ই বা কি কম বেশ আছিস। দারুন একটা স্যুট লাগিয়েছিস ত। আরে পিছনে আবার ধড়াচূড়া আঁটা বেয়ারা হাতে কফির পট আর ট্রে বাঃ লাভ্‌লি, কার জন্যে রে ?

—ওর জন্যে,

বললে ত্রিদিব।

—তবে তোরাও একটু কফি খা। আমি এখুনি অর্ডার দিয়ে দিচ্ছি।

শ্যামলদের দৃষ্টি তখন সুমিতার দিকে।

—দারুণ সাবজেকট্‌ ত ?

সত্যি সুমিতার সেই ছবিখানি ভোলবার নয়। ত্রিদিবের মনে হয়েছিল ওরা বুঝি এখুনি বসে যাবে ক্যান্‌ভাস খুলে।

আব্‌ছা কুয়াশামাখা হলুদ আলোয় ফিকে কমলা রঙের ওভারকোট্‌ গায়ে, পরণে হালকা ইটালিয়ান শিফনের শাড়িতে অজস্র লুণ্ঠিত কুঁচি মাথায় গোলাপী সিল্কের রুমালের বাঁধন টেনে দেওয়া। গালে হাত দিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিষাদ প্রতিমার মত বসেছিল সুমিতা। মনে হচ্ছিল হাতির দাঁত কুঁদে কুঁদে কেউ তাকে নির্জনে গড়েছে।

ত্রিদিবের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে শ্যামল বলেছিল,—কফি টফি চাই না ভাই, আলাপ করিয়ে দে না।

ত্রিদিবের চোখ মুখ কঠিন হয়ে উঠেছিল। কেমন একটা মালিকানার ভাব আর ঘোর অনিচ্ছা খেলা করছিল তার মুখের রেখায় রেখায়।

—না ভাই, এখন না। জলা পাহাড়ে একটা এ্যাকসিডেনট্‌ হবার পর ও কেমন যেন হয়ে গিয়েছে। পরে কলকাতায় গেলে কোনো সময়ে যদি সুযোগ হয়, আলাপ করিয়ে দেব। শ্যামলরা আর কথা বাড়ায় নি। কফি খেয়ে বিদায় হয়েছিল।

কিন্তু কলকাতায় ফিরে এসে হয়ত কোনোদিন এই সব কাহিনী বলে

থাকবে শ্যামলরা। ওরা হয়ত একটু আধটু আন্দোলন করে থেমে গিয়েছিল। ভুলেই গিয়েছিল।

কিন্তু শিশির ভোলে নি।

ত্রিদিব উঠে দাঁড়াল। বলল,

—উঠবে নাকি শিশির,

শিশির আড়ামোড়া ভেঙে পেস্তা রঙা শালটা কাঁধের ওপর ফেলে দিয়ে বলল,

—চলো।

ঝাঁঝা রোদে দু'জনে মিলে রাসবিহারী মোড়ের দিকে হাঁটতে লাগল। হঠাৎ স্তব্ধতা ভঙ্গ করে ত্রিদিব বলে উঠল,

—তুমি শিমূলতলার রায়বাড়ি জানো ?

—বাগবাজারের শিমূলতলার রায়বাড়ির কথা বলছো ?

ত্রিদিব মাথা নাড়ল।

—না চিনে উপায় আছে ? ওরকম একটা অখাদ্য বাড়ি, চুনশুরকির একটা বিতিকিচ্ছিরি বাজে খরচ আর কটাই-বা আছে কলকতায় ?

ত্রিদিব গলা ছেড়ে খুব খানিকটা হাসল শিশিরের কথায়।

—তুমি কিন্তু খুব খাঁটি কথা বলেছ ত্রিদিব। যখনই ওই জংলা প্যাটার্নের বাড়িটার দিকে তাকাই আমারও ঠিক ওই এক কথাই মনে হয়। অথচ, আচমকা থেমে গেল ত্রিদিব। শিশির তাকিয়ে দেখল ত্রিদিবের মুখের উপর বিষণ্ণ একটি ছায়া।

—যখনই মনে হচ্ছে, যে আবার আমাকে ঐ রায়বাড়িতেই ফিরে যেতে হবে, ততই যেন শরীরটা কুঁকড়ে আসছে শিশির। যখন বেরিয়ে পড়েছিলাম তখন ভেবেছিলাম এমন কোথাও যাবো যেখানে সব দুশ্চিন্তা উজাড় করে হাল্কা হয়ে যেতে পারব। এখন আবার সেই বুকভর্তি যন্ত্রনা নিয়ে আমাকে রায়বাড়িতে ফিরে যেতে হচ্ছে।

শিশির বলল,

—তা, রায়বাড়িতে না ফিরে গেলেই ত হয়। ফেরার দরকারটাই বা কি তোমার ?

—সুমিতা। সুমিতা, আমার নিয়তি। যদি সুমিতার ব্যাপারগুলো না ঘটত, যদি জানতাম সুমিতা অন্ততঃ সুখে থাকবে, বেঁচে থাকবে, আমি ঠিক রায়বাড়ি ছেড়ে চলে আসতাম। মোড়ের মাথার সার সার শরবতের বোতল দেখে হঠাৎ ত্রিদিব শুক্‌নো গলায় একটা ঢোক্ গিলল। তার-পব শিশিরকে বলল, এসো একটু গলা ভেজাই।

ছিপি খুলে দোকানদার দুজনের হাতে দুটো খয়েরি বোতল দিল। ভর-ভর করে প্রগল্‌ভ ফেনা বেরোতে লাগল। সেদিকে তাকিয়ে আচম্‌কা ত্রিদিব বলল।

—জানো শিশির আমি এখন রায়বাড়ির একজন অংশীদার। তিন ভাগের একভাগ। খুব কম বিষয় সম্পত্তি নয় ওদের।

তারপর তার সারা মুখ, গলা খুলে ডুক্‌রে কেঁদে উঠতে না পারার যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেল। আবার একবাশ অদ্ভুত, অসংলগ্ন উক্তি করে গেল ত্রিদিব।

—বিশ্বাস করো শিশির, সত্যি বলছি, সুমিতাকে সরল খুন করবেই। আর আমাকে সেই খুনের জন্যে দায়ী করে ফাঁসিকাঠে ঝোলাবে। আর রানী পিসিমা বুড়ো বয়সে কেঁদে কেঁদে অন্ধ হবেন। আর ওই সরল, সবল, তখন মহা আনন্দে সব বিষয় সম্পত্তি ভোগ করবে।

শীতের ঝাঁ ঝাঁ রদ্দুরে ঠিক দুপুরবেলায় দাঁড়িয়ে শিশির কোকাকোলার বোতল গলায় ঢালতে ঢালতে ত্রিদিবের কথা শুনছিল। কিন্তু এমন সাংঘা-তিক একটা উক্তির পরও শিশিরের মুখের একটা পেশিও কুঞ্চিত হতে দেখল না ত্রিদিব। তার কথায় কোনো বিস্ফোরণ এল না শিশিরের ভিতরে। নেহাতই কতকগুলো অর্থহীন ভারি পাথরের মত টুপ, টাপ, করে ভিতরে পড়ে গেল। কি আশ্চর্য।

শিশির বোতলটা নামিয়ে রেখে বলল,—তোমার কি এখন রায়বাড়ি না

ফিরে গেলেই নয় ?

—না শিশিব।

কেমন যেন ছট্‌ ফট্‌ কবে উঠল ত্রিদিব। মাছ যেমন ডাঙায় উঠে খাবি খায় ঠিক সেই রকম।

-- না, না, শিশিব আমি অনেকক্ষণ সুমিতাকে ছেড়ে এসেছি। এভাবে, এভাবে বোধ হয় সুমিতাকে ছেড়ে আসা আমাব উচিত হয় নি। শিশিব আমি এখন যাই। ববং আজ সন্ধেবেলা তোমাব সঙ্গে দেখা হলে আমি অনেক কথা তোমায বলতে পাবব। আমাব কাউকে···কাউকে···খুব দবকাব বলে মনে হয়।

শিশিব মৃদু কণ্ঠে বলল,

—বেশ ত, এসো না। আমাদেব সেই পুবোনো জায়গাটাতে মিট্‌ কবা যাবেখন। হরিশপার্কে। তোমাব ত গাড়ি আছে। অনেক রাত্রি পর্যন্ত দু'জনে আলাপ কবা যাবে।

ত্রিদিব হাত নেড়ে একটা ট্যাকসি ডাকল। দবজা খুলে বলল।

—এসো শিশিব তোমাকে হবিশ মুখার্জি রোডে নামিয়ে দিয়ে যাই।

হবিশপার্কের একটা বেঞ্চে চুপ্‌চাপ্‌ বসেছিল দু'জনে। শিশিব আর ত্রিদিব। পার্কটায় একদম ঘাস নেই। শীতেব কুয়াশায় এখনো দু'চারটি ছেলেমেয়ে খেলে বেড়াচ্ছে। ওদের খেলা যেন চাপা বেদনার মত। এবা সেই সব সৌখীন বাচ্চা নয়। যারা বাহারে জামা পরে, আয়ার কোলে চড়ে বেলুনের বায়না নিয়ে আসে। যাদের মা সাবধান কবে বলে দেয় বিকেলের রোদ ঝুর ঝুর করে ঝরে গিয়ে হিম পড়তে শুরু করলেই ঘরে ফিরিয়ে আনবে বাচ্চাকে।

শিশির আর ত্রিদিব চাদর মুড়ি দিয়ে চুপ্‌চাপ্‌ দেখছিল ওদের। এই সব বেওয়ারিশ বাচ্চাগুলোর চুল রুখু রুখু। জামার পিঠের বোতাম

খোলা, করো বা নগ্ন নিম্নাঙ্গ ধূলি ধূসরিত। মুখে খিদের ছাপ। যেন ওরা খেলা করে করে খিদে ভুলতে চাইছে। আসলে ওরা থাকে এই পার্কেরই আশে-পাশে আনাচে কানাচে গলির ভিতর ঘুঁজি আর বস্তিতে। জায়গা নেই সেখানে নড়বার চড়বার, যেখানে মায়েরা যতক্ষণ বাচ্চা বাইরে বাইরে থকে ততক্ষণ নিশ্চিন্ত।

ত্রিদিবও এক সময় এমনি ছিল। ত্রিদিবের খুব মনে পড়ে। যখন মেসের এক ঘরে থাকত দু'জনে কিছুদিন, তখন দু-একদিন শিশিরকে নিজের সেই দুঃখময় শৈশবের কথাও বলেছে শিশির।

চুপ্‌চাপ্‌ বসে থেকে থেকে পকেট থেকে সিগারেট কেশ্‌টা বের করল ত্রিদিব। শিশিরের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল,

—নাও ধরাও।

পার্কের লাইটপোস্টের টিমে বিদ্যুতের আলোয় দামী লেদারের সিগারেট কেশটার একটি কোণে সোনারজলে কারুকাজ করা ত্রিদিবের নামের আদ্য অক্ষরটা যেন তার চোখ ধাঁধিয়ে দিল।

শিশির ত্রিদিবের হাত থেকে সিগারেট কেশটা নিয়ে উল্‌টে পাল্‌টে দেখছিল। একটু লজ্জিত কণ্ঠে ত্রিদিব বলল, সত্যি, দেখবার মত জিনিষ। তাই না ? আমি ত এতদিন লক্ষ্যই করি নি। কাকাবাবু একবার আমার জন্মদিনে কেশটা আমাকে দিয়েছিলেন। শেষের দিকে, জানো শিশির, শেষের দিকে কাকাবাবুর সব দোষ ঘাট সব অন্যায় আমি কেমন যেন ভুলে গিয়েছিলাম। ভাবা যায় না শিশির, না ?

ধোঁয়া ছেড়ে ত্রিদিব বলল—এমনটা যে ঘটবে তা আমি নিজেই কোনো দিন ভাবতে পারি নি। কিন্তু ঘটেছিল শিশির। কাকাবাবুর ব্যবহারে আমার মনে হয়েছিল, তিনি অনুতপ্ত। অত্যন্ত অনুতপ্ত। মানুষই ত ভুল করে শিশির। আবার মানুষই সেই ভুলের জন্য অনুতাপ করে। তাই না ?

—হ্যাঁ তাই। অনুতপ্ত হওয়াও মানুষের কাজ, আর অনুতপ্তকে ক্ষমা

করাও, মানুষেরই কাজ।

ত্রিদিব কৃতজ্ঞ চোখে শিশিরের দিকে তাকিয়ে বলল,

কোন্ কাকাবাবুর কথা বলছি, তা তুমি বুঝতে পেরেছ শিশির?

শিশির নিঃশব্দে মাথা নাড়ল।

ত্রিদিব মনের মধ্যে এমন একটা তৃপ্তি বোধ করল শিশিরের দিকে তাকিয়ে। শিশিরই ত্রিদিবের একমাত্র পরিচিত সঙ্গী যাকে ও কখনো কখনো অসতর্ক মুহূর্তে নিজের জীবনের দু' চারটে কথা বলেছে। অসতর্ক মুহূর্ত, কারণ ওরা দু জনে বেশ কিছুদিন কালীঘাটের একটা মেসে এক ঘরে ছিল। তাই প্রত্যেক মাসে কাকাবাবুর পাঠানো মনিঅর্ডার নেওয়ার ঘটনাগুলো সে দেখতে পেত। কখনো কখনো ত্রিদিব মনিঅর্ডারের রিসিটগুলোও তাকে দেখিয়েছে। না দেখিয়ে পাবে নি। শিশির ভ্রূকুঞ্চিত করে ত্রিদিবকে জিজ্ঞেস করল,

—হ্যাঁ, তোমার বাবার ব্যবসার সমস্ত অংশ ফাঁকি দিয়ে যিনি লাখপতি থেকে কোটিপতি হয়েছিলেন। সেই কাকাবাবুর কথা বলছ ত?

ত্রিদিব মাথা নাড়ল।

বাচ্চাগুলো অনেকক্ষণ হল চলে গেছে পার্ক থেকে। ঠাণ্ডা কনকনে একটা আবহাওয়া ঘিরে ধরেছে দু'জনকে। ক্বচিৎ দুএকটি পথচারী যাচ্ছে আসছে পার্কের ভিতরকার ঘাস দমিয়ে দমিয়ে গজানো সরু একটা পায়েচলা রাস্তা দিয়ে। তারই একজনের পায়ে লেগে একটা লাল প্লাস্টিকের বল ঠিক্‌রে এল ত্রিদিবের দিকে। ত্রিদিব সেটাকে পা দিয়ে আটকে ফেলে কেমন যেন অন্যমনা হয়ে গেল। ছোটবেলার অনেক দুঃখের মুহূর্ত যেন আবার ফিরে এল তার স্মৃতিতে। তার মা যে কবে মারা গিয়েছিলেন তা সে জানেই না। বোধহয় জন্মের কয়েকমাস বাদে। তারপর বাবা যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলেন। ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন এখানে ওখানে। ব্যবসাপত্র কিছুই দেখতেন না। নিশানাথ রায়ের হাতেই তখন সব ভার।

বাবা মারা যাবার পর নিশানাথ রায় আর তাঁর স্ত্রী অমিয়া দেবী ত্রিদিব-কে নিজেদের কাছে নিয়ে গেলেন। তাঁরা ছিলেন নিঃসন্তান। নাবালক ত্রিদিবকে শেষ পর্যন্ত তাঁরা দত্তক নিয়েছিলেন। ত্রিদিবেব এখনো আবছা মনে পড়ে। খুব সুন্দব বঙীন খেলনা পুতুল দিয়ে সাজানো একখানি ঘব, আর সেই দারুণ বংকবা গন্ধমাখা অদ্ভুত মহিলা তাকে রোজ নিয়ম কবে কোলে তুলে আদব কবতেন। কাকাবাবুও আদব করতেন। মস্ত বড় সড় স্যুট পবা জাঁদবেল চেহারাব একজন ভদ্রলোক। প্রায়ই তাদের বাড়িতে যেতেন, বাবা বেঁচে থাকতে তার হাতে চকোলেটেব বাকস্ গুঁজে দিতেন। এ বাড়িতে যখন দত্তকপুত্র হয়ে থাকতে এল বছর চারেক বয়সে তখন কাকাবাবু তাকে কোলে তুলে নিয়ে বলতেন—ত্রিদিব তুমি যদি আমাকে 'বাবা' বলে ডাকা অভ্যেস কবতে পাবো, তাহলে একটা কবে ঝকঝকে রূপোব টাকা পাবে বোজ। ত্রিদিব খুব চেষ্টা করত কিন্তু কোথায় যেন বেধে যেত তার। খালি বাবাব মুখ মনে পড়ে যেত তার। তার বাবা এত অন্য বকম দেখতে ছিলেন। এত অন্য রকম। ত্রিদিব সাবাদিন খেলাব ঘবেব মধ্যে খেলনা নাড়াচাড়া করে কাটাত। ঝি দাসী-দেব যান্ত্রিক যত্ন আর কাকাবাবুব সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া। একবার পুরী আর একাবব কাশ্মীর গিয়েছিল ত্রিদিব ওঁদের সঙ্গে।

প্লেনেও চড়েছিল।

কাকিমা, বাড়িতে লোকজন এলে ত্রিদিবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলতেন—আমার ছেলে। আমার স্বামীর মৃত পার্টনারের ছেলে বলে পরিচয় দিতেন না।

কিন্তু অত আদর ভালোবাসা সত্ত্বেও ত্রিদিবের কাকিমার চেয়ে আয়াদের সঙ্গই ভালো লাগত। বিকেল বেলা আয়া রায়বাড়ির পার্কের মত বিরাট বাগানে ঘোরাতে ঘোরাতে ত্রিদিবকে বলত।

—জানো খোকাবাবু, একদিন তুমি এই বিরাট বাড়ি—এই সব গাড়ি, লোকজনের মালিক হবে তখন এই বুড়ি আয়াকে মনে রাখবে ত?

ত্রিদিব বলত,

—হ্যা, মনে রাখব, তখন তোমায় কত নতুন খেল্‌না কিনে দেব দেখো।

মাঝে মাঝে খাঁচার পাখীকে মুখ বদলাবার জন্য আয়ারা নিয়ে যেত কাছা-কাছি পার্কে। সেখানে আয়াদের মজলিশে ওব সৌভাগ্য নিয়ে নানারকম গল্প ফাঁদত।

—খোকাটার ভাগ্যটা কিন্তু ভাই খুব ভালো।

ওর মা বাবা খুব ছোট বয়সেই ত গেছে। টাকা পয়সাও কিছু ছিল না। তা আমাদের বাবু গিন্নিমার ত দয়ার শরীর।

ত্রিদিব চোখ বড় বড় কবে শুনত,

—বাবু গিন্নিমা, খোকাটাকে দত্তক নিয়েছে। এখন কত টাকাব মালিক বলতো?

কিন্তু তারপর?

ত্রিদিবেব মনে পড়ল কত দ্রুতবেগে তার সেই বানানো স্নেহের স্বর্গ থেকে তার অধঃপতন ঘটল। আসল রক্তের টানে। অনেক কষ্টে সৃস্টে যে স্নেহ তৈরী করেছিলেন সন্তানহীন দু'টি স্বামী স্ত্রী, তা উবে গেল এক মুহূর্তের মধ্যে। ত্রিদিবের যখন ছ'বছর বয়স তখন কাকিমার একটি মেয়ে হ'ল।

ব্যস্।

একদিনের মধ্যেই রায়বাড়ি থেকে প্রায় উপড়ে ফেলা হ'ল ত্রিদিবকে। সামান্য একটা মাসোহারায় একটা প্রায় অনাথাশ্রম টাইপের নিম্নব্যয়ের হোস্টেলে চালান করে দেওয়া হ'ল ত্রিদিবকে।

কোথায় গেল তাব সেই খেলার ঘর। নরম বিছানা।

আয়ার দরদ, চাকর বাকর বাগান পার্ক। স্বপ্নের মত মিলিয়ে গেল। বাস্তব রুক্ষ একটা জগতে এসে দাঁড়াল ত্রিদিব। কেঠো তক্তাপোষ, চা রুটি, আর ঝোল ভাতের জগতে। আর মারধোর মাস্টার মশাই আর হোস্টেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কঠোর ব্যবহার।

মাসে মাসে অল্প কয়েকটা টাকা। কাকা কাকিমার অবস্থার পক্ষে কিছুই না। তবু সেটুকু খরচ করতেই বুক ফেটে যেত তাঁদের। ত্রিদিবকে আর কোনোদিন দেখা দেন নি তাঁরা। গরমের ছুটি আর পুজোর ছুটিও তার হোস্টেলের শূন্য ঘরগুলোয় ঘুরে ঘুরে কাটত। বড় হয়ে যখন কলেজে পড়ছে তখনো ওই যৎসামান্য টাকা নিয়ে কত টাল-বাহানা। শিশিরও দেখেছে। কিন্তু সেজন্য ত্রিদিব কোনদিন কাকাবাবুর কাছে দরবার করতে যায় নি বা চিঠি লেখে নি। কাকাবাবু শেষের দিকে মাঝে মাঝে ছ'তিন মাস টাকা পাঠানো বন্ধ রাখতেন। তখন শিশির অনেক সময়েই বলেছে,—তুমি তোমার শেয়ার, অংশ সব দাবী করো না কেন ত্রিদিব,?
ত্রিদিব কেবল মাথা নাড়াত। কিছু বলত না।
কতবার যে মেসের ম্যানেজার নোটিশ দিয়েছেন ত্রিদিবকে। কতবার যে মিল্ বন্ধ করে দিয়েছেন।
কাকাবাবু তার মনিঅর্ডার ফর্মে মাঝে মাঝে ছুচার লাইন করে উপদেশও ঝাড়তেন। শিশির দেখেছে। যেমন, 'ত্রিদিব আশা করি আর কয়েক মাস পরে তুমি স্বাবলম্বী হইতে পারিবে।
তোমাকে এইভাবে টাকা পাঠাইতে হইবে না। তুমি নিজেই যাহাহোক ব্যবস্থা করিয়া লইবে।'
—ইত্যাদি—ইত্যাদি।
ত্রিদিব তাই বি. এস-সি. পাশ করে প্রথমেই যে চাকরিটা পেয়েছিল সেইটাই নিয়ে নিয়েছিল। তারপর কাকাবাবুকে একটা শুক্‌নো চিঠি লিখে দিয়েছিল।
আপনাদের সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ, কিন্তু আর সাহায্যের প্রয়োজন নেই।
চিঠিটা তাঁরা পেয়েছিলেন কারণ তারপর থেকে আর তার নামে কোনো টাকা আসে নি।
শিশির বলল,—ঠাণ্ডা বাড়ছে, চলো, এবার ওঠা যাক্।

ত্রিদিব বলল।—বেশ ত চলো না কোনো রেস্তোরাঁয় যাই। পার্কের বাইরে আমার গাড়ি আছে।

—রাত আট্টা বাজে কিন্তু,

—আমি তোমায় পৌছে দিয়ে যাব শিশির!

ত্রিদিবের গলায় এমন একটা আকুতি ছিল যে শিশির আর 'না' বলতে পারল না।

ত্রিদিবের গাড়িতে ওর পাশে বসতেই, বেগে গাড়িটা চালিয়ে দিল ত্রিদিব। এমন আচমকা প্রচণ্ড বেগ, যে শিশির খানিকটা চম্‌কে গেল। ড্যাস্‌বোর্ডের লাল্‌চে আলোর আভায় তার মুখের রেখাগুলি কেমন কঠিন দেখাচ্ছিল। শিশির বলল—শোনো ত্রিদিব তুমি যেন আজকাল কিরকম অন্য রকম হয়ে যাচ্ছ। তোমার চালচলনে কেমন একটা ছট্‌ফটে ভাব…

ত্রিদিব বলল,

—আমার অবস্থায় পড়লে শিশির তুমিও এমন শান্ত হয়ে বসে থাকতে পারতে না।

—তুমি পোষাক আসাকেও ত এমন জম্‌জমাট কোনোদিন ছিলে না!

—না ছিলাম না। থাকতেও চাই নে। আমার সহজ সরলভাবে থাকতে পারলে অনেক ভালো লাগত কিন্তু,

শিশির জিজ্ঞাসু চোখে ত্রিদিবের দিকে তাকাল। ত্রিদিবের সঙ্গে চোখা-চোখি হতেই একটু অপ্রতিভ হেসে ত্রিদিব বললে,

—জানো না রানী পিসিমা ভালো পোষাক আসাক পরবার জন্য এত চাপাচাপি করেন। আসলে আমি রানী পিসিমার কোনো আদেশই অমান্য করতে পারি নে। রানী পিসিমাই পছন্দ করে আমার সব জামা কাপড় কিনে দেন।

গাড়ি চৌরঙ্গির দিকে চলেছে। ময়দান পেরিয়ে গেল। ত্রিদিব শিশিরের মুখের দিকে বারবার তাকাচ্ছিল। তার বলার কথা এখনও আরম্ভই

হয় নি। অথচ শিশিরের চোখে কোনো প্রশ্নই নেই, কত নতুন নাম করল ত্রিদিব, সুমিতা, রানী পিসিমা, সরল। কিন্তু শিশিরের কিছু জিজ্ঞাস্যও নেই ওদের সম্বন্ধে। আশ্চর্য!

গাড়িটা তখন চৌরঙ্গি পেরিয়ে একটা বার রেস্তোরাঁয় ঢুকেছে, লাল কার্পেট মোড়া সিঁড়িতে জুতো শুদ্ধ পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে ওপরে উঠল দু'জনে। কাঁচের দরজা ঠেলে ঢুকল অন্ধকার একটা বড় হলঘরে। সুখাদ্যের মৃদু মনোরম গন্ধ। ভোজনবিলাসীদের আবছা দেহ। শুধু খাদ্যবস্তু স্তূপাকার করা টেবিলের উপরে উপরে ঘোমটা টানা আলো। আর মৃদু গানের সুর। কোণের দিকে একটা টেবিলে এসে বসল দু'জনে। সামান্য কিছু খাবারের অর্ডার দিয়ে শিশিরের দিকে মুখ ফেরালো ত্রিদিব।

ত্রিদিব একবার ভাবলে সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে চলে যাবে। আগে শিশিরের সঙ্গে যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করত ত্রিদিব। শিশিরের কবিতা? কতদিন শিশিরের কবিতা পড়ে নি ত্রিদিব।

আধুনিক সাহিত্য?

নাঃ কতদিন যে পত্র-পত্রিকার পর্যন্ত পাতা উল্টোয় নি সে।

তাহলে সিনেমা?

নাঃ তাও না। সিনেমা হলে দু'একবার গেছে হয়ত। কিন্তু কি যে দেখেছে কে জানে?

রাজনীতি?

উঃ এককালে খবরের কাগজ খুলে রাজনৈতিক উত্থান পতন সমস্যার সম্ভাব্য নানান পরিণতি নিয়ে উত্তেজিত আলোচনায় কি নিদারুণ আগ্রহই না ছিল তার। আজকাল সবই যেন মিথ্যে মেকি অপ্রয়োজনীয় ব'লে মনে হয় তার।

এখন শুধু একটা বিষম জরুরী সত্যি, অবশ্যম্ভাবী ঘটনা তার চোখের সামনে লাল হয়ে ঝুলছে। তাহ'ল সুমিতাকে সরল শিগ্‌গিরই খুন করবে আর সে খুনের জন্য দায়ী করবে ত্রিদিবকে। তার পর ত্রিদিবকে ফাঁসী

কাঠে ঝুলিয়ে তিনজনের অংশ সে একা একা ভোগ করবে।
শিশিরের দিকে তাকিয়ে ত্রিদিব বলল।
—আমি একটা দারুণ সন্দেহের ফেরে পড়েছি শিশির। অথচ আমার এই সন্দেহের কথা কেউ বিশ্বাস করতে চাইছেন না। এমন কি রানী পিসিমাও নয়।
—তোমার রানী পিসিমা কি বলেছিলেন ?
—রানী পিসিমাকে আমি কালকেই আমার ঘরে নিয়ে গিয়ে আমার সমস্ত সন্দেহের কথা খুলে বলেছিলাম। রানী পিসিমা আমার চুলে বিলি কেটে দিতে দিতে বলেছিলেন যে। ত্রিদিব তুমি যে সন্দেহের কথা আমাকে বললে তা তুমি নিজেই কি সত্যিই বিশ্বাস করো ?
আমি বলেছিলাম,—'করি'।
রানী পিসিমা আবার প্রশ্ন করেছিলেন,—ত্রিদিব তুমি ভেবে চিন্তে কথাটা বলছ ত ?
তখন সেই মূহূর্তে, জানো শিশির, রানী পিসিমা নরম ঠাণ্ডা হাতে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন, আমার মনের সব উত্তেজনা নিস্তেজ হয়ে আসছিল। মনে হচ্ছিল—দূর, কি সব ভেবেছি সরল সম্বন্ধে। এই নিছক ছেলেমানুষী।
রানী পিসিমা কাল আমাকে অনেক কথা বলেছিলেন।
বলেছিলেন—'দেখো ত্রিদিব জীবনের সবচেয়ে বড় শিক্ষা বোধহয় নিরপেক্ষ থাকার শিক্ষা। জীবনের কতকগুলো মর্মান্তিক সত্যের মুখোমুখি হয়েছিলাম আমি। তুমিতো জানো আমি কিভাবে বঞ্চিত হয়েছি জীবনের কাছে। আজ তোমাকেও মুখোমুখি হতে হচ্ছে। এখন তোমার কিন্তু সবকিছুকে খুব নিস্পৃহ হয়ে যাচাই করে নিতে হবে।
তুমি তাই এত বড় একটা সন্দেহ করবার আগে খুব ভালো করে সরলের সম্বন্ধে তোমার মনোভাবের কথাটা ভেবে দেখবে।
জানো শিশির কাল রানী পিসিমার চোখে সমস্ত ব্যাপারটা আবার নতুন

করে যেন দেখতে পেলাম আমি। রানী পিসিমা হয় ত বুঝতে পেরেছেন যে সুমিতা আমাকে তেমন চায় না।

হয়ত তাঁর কথাই ঠিক। তিনিও ত একজন মেয়ে।

তিনি সুমিতাকে আমার চেয়ে অনেক বেশিদিন ধরে, অনেক বেশি করে জানেন। সরলকেও জানেন। তিনি হয় ত ভেবেছিলেন আমি সরলের সম্বন্ধে জেলাস হয়ে গেছি বলেই সরল সম্বন্ধে এইসব সন্দেহ করছি।

তিনি বলেছিলেন,

—সরলকে ত আমিও ঠিক পছন্দ করি না। কোথা থেকে যে উড়ে এসে জুড়ে বসল? কিন্তু তা বলে ও সুমিতাকে খুন করবার চেষ্টা করবে? না, না ত্রিদিব। আমার এমনটা মনে হয় না। সরল সুমিতাকে খুব ভালো-বাসে। আর সুমিতাও সবলকে।

—শিশির, রানী পিসিমা এই কথাগুলো আমাকে কিন্তু মনে আঘাত দেবাব জন্যে বলেন নি। তিনি বলেছিলেন কতকগুলো সত্যের সঙ্গে আমাকে মুখোমুখি কববার জন্য। সত্যি, কাল রানী পিসিমার কথায় তাঁব দৃষ্টিকোণে সমস্ত ঘটনাগুলো দেখতে গিয়ে আমি যেন আমার সমস্যার সত্যিকাব চেহারাটা দেখতে পেয়েছিলাম।

আমার মনে হয়েছিল সত্যিই ত, সুমিতা ত সরলকেও প্রশ্রয় দেয়। ঠিক আমারই মত। কত ছোটখাটো ঘটনার কথা ফিরে ফিরে মনে আসছিল আমার। সুমিতা আর সবলের কত ছোটোখাটো অন্তরঙ্গতার কথা। ভেবেছিলাম হুঁ. হতেও পারে। হয় ত আমি শাদাচোখে সমস্ত ঘটনাটা দেখতে পাচ্ছি না।

সবটাই রঙীন।

মনে করেছিলাম আমি বোকা। ভুল করেছিলাম।

আমি ভেবেছিলাম যেহেতু সুমিতা আর সরল আমার রায়বাড়ি আসার অনেক আগে থেকেই একসঙ্গে একই বাড়িতে থাকে বলে, আর সমবয়সী বলে ওদের সম্বন্ধটা নেহাতই নিষ্পাপ। সবরকম সাংসারিক ব্যাপারেই

সরল আমার চেয়ে অনেক বেশি পটু বলেই সুমিতা সরলের ওপর ওই সব ব্যাপারে বেশি নির্ভর করে।

কিন্তু…

অনেকক্ষণ একতরফা প্রাণখুলে নিজের মনের কথা গড় গড় করে বলে গিয়ে এবার থামল ত্রিদিব। দেখল শিশির একমনে তার কথাগুলো যেন গিলছে। এত মনোযোগ দিয়ে শুনছিল শিশির যে সামনে রাখা কফির পেয়ালা বা খাদ্য স্পর্শও করে নি।

ত্রিদিব বলল,

—আসলে জানো ত্রিদিব, আমি হলাম বিজ্ঞানের ছাত্র। আমরা কোনো বিষয় সম্বন্ধে সত্যতা জানতে গেলে মিনিমাম তিনটে রিডিং ত নেবই নেব। তারপর তাদের গড় মিলিয়ে সত্যকে বা সত্যের কাছাকাছি যা তাকে খুঁজে বের করে নেব।

রানী পিসিমা নিউট্রাল মানুষ। আমার মত তাঁর দাঁড়িপাল্লায় ভালোবাসার 'পাসান' নেই, তুমিও তাই।

রানী পিসিমার 'অবজারভেশন' নিয়েছি। এবার তোমায় সব খুলে বলছি। তোমার মতামতের জন্য। আরো একজনকে চাই আমার। কিন্তু কেবল ভয় হচ্ছে শিশির। মনে হচ্ছে বড্ড দেরী হয়ে যাচ্ছে। হয় ত আজ, হয় ত কালই যা ঘটবার তা ঘটে যাবে। আমার মনের ভার আর কারো কাছে অকপটে এমনিভাবে নামিয়ে দিতে পারব না। হয় ত, হয় ত, আমার তৃতীয় নিরপেক্ষ শ্রোতা হবেন আদালতের বিচারক স্বয়ং। কাঠ-গড়ায় দাঁড়িয়ে হয় ত আমাকে শেষ কথা বলতে হবে।

ভয়ে আতঙ্কে ত্রিদিব যেন থরথর করে কেঁপে উঠল। দু'হাত বাড়িয়ে শিশিরের হাত দু'খানা ধরে অস্ফুট গলায় বলল,

—তুমি বিশ্বাস করো শিশির। রানী পিসিমা যাই-ই বলুন, আমার মন বলছে সুমিতা শিগ্‌গিরই খুন হবে। সরল তাকে খুন করবে। আর সেই খুনের জন্য সে দায়ী করবে আমাকে। তারপর সুমিতাকে আর আমাকে

সরিয়ে দিয়ে সরল নিষ্কণ্টক হয়ে আমাদের সমস্ত বিষয়সম্পত্তি ভোগ করবে।

শিশির ত্রিদিবের হাত দুখানি পরম মমতায় ধরে রইল। ছেড়ে দিল না। তাবপর বলল,

—মন খুলে খানিকটা ত বলতে পেরেছ। এবার নিশ্চয় ভিতরের কষ্টটা খানিকটা অন্ততঃ হাল্‌কা হয়েছে। এখন কপালের ঘামটা মোছো ত। একপট কফি আনতে দিই। খাও। তারপর তোমার সন্দেহের কথা-গুলো আস্তে আস্তে বলো আমাকে।

ত্রিদিব পকেট থেকে সুগন্ধি রুমাল বের করে কপালের ঘামটুকু মুছে নিল। তারপর গরম কফির পেয়ালাটা টেনে নিয়ে লম্বা একটা চুমুক দিয়ে বলল,

—বুঝতে পারছি না ঠিক কোথা থেকে আরম্ভ কবব শিশিব। আমার মনের মধ্যে ঘটনাগুলো এমনভাবে শেকড় গেড়েছে যে মাঝে মাঝে রাতে দুঃস্বপ্ন দেখে আমি ঘেমে নেয়ে জেগে উঠি। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। মাথা এত গরম হয়ে যায় যে পাগলেব মত বারান্দায় ঘুরি। আমার সমস্ত অবচেতন মনটাই যখন এত সন্ত্রস্ত তখন কি করে বলি যে সন্দেহের পুরো ভিতটাই মিথ্যে ?

স্বপ্নের মধ্যে আমি দেখি রায়বাড়ির চারতলার জ্বলন্ত আগুনের লকলকে শিখার মধ্যে পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে সুমিতা। ওর মাথাকুটে মরা ছুটন্ত মূর্তিটা চিৎকার করে উঠছে—বাঁচাও, বাঁচাও! আমি জ্বলে পুড়ে মরে গেলাম।...স্বপ্নে দেখি জলাপাহাড়ের কুয়াশা ভরা খাদের মধ্যে কে যেন ঠেলে ফেলে দিচ্ছে সুমিতাকে। আমি কিছুতেই তাকে ধরতে পারছি নে। সুমিতা যেন খসে পড়া একটা ফুলের মত। খাদের অন্ধকারে হালকা হয়ে নেমে যাচ্ছে। আমি যেন স্বপ্নে দেখতে পাই সুমিতাকে কে যেন খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে মেরে ফেলছে। বিছানায় এলিয়ে পড়ে আছে সুমিতা। আড়ষ্ট আর নীল হয়ে গেছে। কেন শিশির ?

তুমি বলো কেন আমি এমন স্বপ্ন দেখি? বার বার দেখি?
শিশির বলল,
ত্রিদিব তুমি আজ যত রাত্রিই হোক, তোমার মনের মধ্যে যা কিছু জমা হয়ে আছে সব আমাকে বলে হাল্‌কা হয়ে তবে বাড়ি যাবে।
ত্রিদিব গাঢ়কণ্ঠে বলল,
—তাই-ই যেতে হবে শিশির। নাহলে আমি নিজেও পাগল হয়ে যাবো।
একটু ভেবে ত্রিদিব বলল,
—আমি বরং যেখান থেকে তোমার সব অজানা, আমার জীবন আমার রায়বাড়িতে আসার কাহিনী সেখানে থেকেই তোমায় সব বলি।

বাড়ি ফিরে এসে সেদিন রাত্রে শিশিরের মাথায় কেবল ত্রিদিবের কাহিনীগুলো ঘুরপাক খেতে লাগল। খুব সংক্ষেপে নিজের মনের মধ্যে সে কাহিনীটি পরপর সাজিয়ে নিচ্ছিল। শিশিরের সঙ্গে ত্রিদিবের ছাড়াছাড়ি হয়েছিল ত্রিদিবের ঐ রিসার্চ এ্যাসিস্ট্যাণ্টের চাকরি যাওয়ার পর। তখন শিশিরের দাদা কলকাতায় চলে এলেন, হরিশ মুখার্জি রোডে দাদা একটা বড় বাড়ি ভাড়া করে শিশিরকে নিজের কাছে নিয়ে রাখলেন। এক মেসে একঘরে বসবাস করা বন্ধ হলেও দেখাসাক্ষাৎ বা আড্ডা বন্ধ হয় নি দু'জনের। তবে সে খুব একটা নিয়মিত নয়। কিন্তু সব সময়ই, দেখা হোক আর না হোক শিশির ত্রিদিবের সম্বন্ধে একটা আকর্ষণ বোধ করেছে। ত্রিদিবও শিশিরের যদ্দুর ধারণা শিশিরকে খুব পছন্দ করে।
ত্রিদিবকে অনেক দিন দেখতে পায় নি শিশির। কালীঘাট রোডের সেই মেসের বোর্ডারদের দু-একজনের সংগে দেখা হলে ত্রিদিবের খোঁজ

নিয়েছিল সে। শেষ শুনেছিল, ত্রিদিব নাকি মেস ছেড়ে দিয়ে কোন আত্মীয়ের বাড়ি গিয়ে উঠেছে।

শিশির একটু অবাক হয়েছিল। ত্রিদিবের আত্মীয় ?

তারপর ভেবেছিল, হবেওবা।

আসলে ত্রিদিব তখন ডক্টর অমরেন্দ্রনাথ সাহার রিসার্চ লেবরেটরিতে তাঁর এ্যাসিসট্যান্ট হিসেবে কাজ করছে। ছোট-খাটো লেবরেটরি। ডক্টর সাহা লোহা এবং ইস্পাতের ওপর নানারকমের এ্যাসিডের প্রক্রিয়ার ওপর পরীক্ষা-নীরীক্ষা করছিলেন। তাঁর কাজের ওপর ক্রমশ সরকারের চোখ পড়ে। দেশের শিল্প-বাণিজ্য যে ভাবে বাড়ছে তাতে এই কাজে সাহায্য পাওয়া খুব একটা কঠিন ব্যাপারও না। ডক্টর সাহাও আবেদন করে খানিকটা সরকারী সাহায্য পেয়ে তাঁর লেবরেটরি আর একটু বাড়িয়েছিলেন। রায়বাহাদুর নিশানাথ রায়েরও লোহার কারখানা ছিল। তিনি একজন শিল্পপতির সঙ্গে ডক্টর সাহার লেবরেটরি দেখতে আসেন। এখানেই অনেক দিন পরে ত্রিদিবের সঙ্গে তাঁর ফিরে দেখা হয়ে যায়। ত্রিদিবের পরিচয় জেনে, তার কাজ দেখে তিনি প্রথমে টেলিফোনে তার খোঁজ-খবর নিতে শুরু করেন, তারপরে মাঝে মাঝে দেখা করতে থাকেন। এইভাবে আবার পরিচয় শুরু।

ত্রিদিব বলেছিল, তার কেমন যেন মনে হত কাকাবাবু যেন অনেক বদলে গিয়েছেন। ত্রিদিবের সংগে যতক্ষণ থাকেন, যেন খুব একটা স্বস্তিতে থাকেন। ত্রিদিবকে নিয়ে মাঝে মাঝে লংড্রাইভে চলে যেতেন। একবার ত তিনদিনের জন্য দীঘাই বেড়িয়ে এলেন। তখন সেই শহরের বাইরের নির্জনতায় লোকটির রেখায় ভরা অনুতপ্ত মুখ দেখে ত্রিদিবের আর কোনো পুরোনো শোকের কথা মনেই আসত না। তিনি বার বার বলতেন, জীবনে অনেক ভুল করেছেন তিনি, অন্যায় করেছেন। অনেক মানুষই করে। তাবলে কি মুক্তি নেই, ক্ষমা নেই।

এইভাবেই একদিন বেলুড়মঠের গঙ্গার ধারে বসে তিনি ত্রিদিবের

হাত দু'টি নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলেছিলেন,

—ত্রিদিব, এবার তুমি আমার কাছে ফিরে চলো।

—সেইদিনই তাকে বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সুমিতা সরল আর রানী পিসিমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। সেই থেকেই ত্রিদিব রায়-বাড়িতে।

তারপর যে কমাস তিনি বেঁচেছিলেন ত্রিদিবকে আর নিঃশ্বাস ফেলতে দেন নি। তুমি সকাল বেলা আমার সঙ্গে বেরোবে ত্রিদিব। আমাব বসির-হাটের কারখানায় যাবে, ওখানে কাসটিং দেখবে ঢালাই দেখবে। কোনো দিন তাকে নিয়ে যেতেন ইঞ্জিনীয়ারবাড়ি নতুন কারখানার মেশিন ঘরের ডিজাইন দেখাতে। ত্রিদিবের সঙ্গে বাড়ি ফিরে এসেও তিনি বসতেন নানান আলোচনায়। অবশ্য সেখানে রানী পিসিমা থাকতেন। সরলও থাকত।

সরলকেও নিশানাথ রায় যথেষ্ট স্নেহ করতেন, তা সত্ত্বেও ত্রিদিবের জন্য তিনতলার দক্ষিণের ঘরটা বরাদ্দ হতেই সরল রেগে অস্থির। তবে সরল চাপা ছেলে। তার রাগ কখনো বোঝা যায় না।

শিশির তার চিন্তার প্রবাহটি একটু রুদ্ধ করে দিয়ে ভাবল ত্রিদিব তাহলে সরলের রাগ বা অসন্তোষের মনোভাবটা কি করে বুঝতে পারল? জেনে নিতে হবে ভেবে নিল ত্রিদিব।

আর সরল?

সরলও ত্রিদিবের মত। নিশানাথ রায়ের সম্পর্কে কেউ নয়। আশ্রিত। তারই মত সামান্য একজন মেকানিক্ হিসেবে তার জীবন শুরু। কাকা-বাবু আর সুমিতাকে একটা এ্যাক্সিডেণ্ট থেকে বাঁচিয়ে দিয়ে সরল তাঁর চোখে পড়ে যায়। তারপর তর্ তর্ করে উঠতেই থাকে। সরল কারখানার কাজ কর্ম সত্যিই ভালো বুঝত। ক্রমশঃ সে নিশানাথ রায়ের ডান হাত হয়ে দাঁড়ায়।

ম্যানেজারকে ম্যানেজার, সেক্রেটারীকে সেক্রেটারী। কারণ নিশানাথ

রায়ের আইডিয়াগুলো সব সেকেলে। তাঁর ধারণা ছিল ভালো লোকের ছেলে সব সময়েই ভালো মানুষ হয়।

ত্রিদিব কিন্তু এসব থিয়োরী বিশ্বাস করত না। শিশিরকে সে প্রশ্ন করে-ছিল,

—সত্যি শিশির, তুমিই বলো না, ভালো মানুষ, বড় মানুষ, আদর্শবাদীর ছেলে কি সব সময়েই আদর্শবাদী হয় ?

শিশির মৃদুহেসে বলেছিল,

—হয় কি না হয় জানি নে, তবে ধারণাটা বিশ্বাস কবতে ত ভালোই লাগে!

যেহেতু সরল বিপ্লবী সঞ্জয় মিত্রেব ছেলে, সেহেতু—সে নাকি খুব ভালো হবেই। তাব চবিত্রগুণ থাকবেই। যাকে বলে ক্যাবেক্‌টাব।

—বিপ্লবী সঞ্জয় মিত্র। কে তিনি ? খুব একটা নামটাম শুনেছে বলে ত মনে হ'ল না শিশিরেব।

তবে নিশানাথ রায় তাঁকে চিনতেন। বানী পিসিমাও, কারণ তিনি ছিলেন গোয়াবাগানের ছেলে। সক্রিয় বিপ্লবে তাঁর আর অংশ নেওয়া হয় নি। রাজগীরের পাহাড়ে বোমা তৈবী করে পরীক্ষা করতে গিয়ে সেই বোমা বার্ষ্ট্ করে তিনি মারাত্মক রকম আহত হয়েছিলেন। তারপর তাঁর আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি। তিনি কয়েক বছর বাদে মারা যান। তাঁর তখন বিয়ে হয়েছিল। সেই স্ত্রীও মারা যায়। সরল তাঁদেরই ছেলে। গোয়াবাগানে দরিদ্র মামাদের কাছেই সে মানুষ।

ত্রিদিবের মনে হয়েছিল রায়বাহাদুর নিশানাথ রায়ের সরল সম্বন্ধে নরম থাকার কারণটা সম্পূর্ণ তাঁর নিজের একটা ব্যক্তিগত দুর্বলতা থেকে উপজাত। কারণ সরলের সঙ্গে তাঁর অনেকগুলো অদ্ভুত ধরনের মিল ছিল।

ত্রিদিব বলেছিল,

—জানো শিশির, কাকাবাবুর জীবনের লক্ষ্য ছিল যেন তেন প্রকারেণ

ওপর তলায় ওঠা। আজকাল তোমরা যাকে বলো রুম্ অ্যাট্ দি টপ্। ওপরে উঠতে হবে, উঠতেই হবে, এই চিন্তাটা একটা সাইনাসের যন্ত্রণার মত মাথার ভিতরে বিঁধিয়ে নিয়ে একদল লোক জীবনের সরু সরু অলি-গলি পথ থেকে বেরিয়ে ছোট রাস্তা সেজ রাস্তা মেঝ রাস্তা বড় রাস্তা ধরে জীবনের মোড়ে এসে দাঁড়িয়ে যায়। যে কোনো ভাবেই হোক। ভালো মন্দ অন্যায় ন্যায় কিছুই মানে না, কাকাবাবুও ছিলেন তাদেরই দলের মানুষ। আর সবলও সেই জগতের।

কাকাবাবু ছিলেন দিন আনে দিন খায় এমনি ঘরের ছেলে। তাঁদের গ্রামের নাম ছিল দেউলচাঁপা। গ্রামের একটি কোণে নাকি বিরাট এক দেউল মন্দির ছিল চামুণ্ডা কালীর। সেই মন্দির ঝড়ে ভেঙে পড়ে চামু-ণ্ডার প্রতিমা চাপা পড়ে যায়। হয় ত সেইজন্যই গ্রামের নাম ছিল দেউল চাপা। চাপা থেকে লোকমুখে ক্রমশ চাঁপা হয়ে গিয়েছিল।

সেই গ্রামেরই অতি দরিদ্র ঘরের ছেলে ছিলেন রায়বাহাদুর নিশানাথ রায়। অবস্থা বদলাবার উচ্চাশা নিয়ে তিনি কলকাতায় এসে আশ্রয় নিলেন তাঁর গুরুবংশের সুরেন চক্রবর্তীর বাড়ি। কলকাতায় একটি মন্দিরের পুরোহিত ব্রাহ্মণের কাজ নিয়ে সুরেন চক্রবর্তী গোয়াবাগানের ছোট একটি বাসাবাড়িতে থাকতেন। বাসাবাড়ি মানে খোলার চাল দেওয়া দুটি ঘর। তাঁদের বংশের অন্য সরিকরা থাকতেন দেউলচাঁপা গ্রামের দেউলের ভাঙা স্তূপের পাশে এক জঙ্গলের ধারে। তাঁরা ছিলেন ঘোর শাক্ত বংশ। সুরেন চক্রবর্তী বোধ হয় সামান্য কিছু লেখাপড়া করেছিলেন তাই তিনি কলকাতায় এসেছিলেন ছেলেমেয়েদের একটু আধুনিকভাবে মানুষ করার জন্য।

নিশানাথ রায় এঁদেরই ঘরের একটি কোণে আশ্রয় নিয়ে কলকাতায় চাকরি খুঁজতে লাগলেন।

ত্রিদিব হেসে বলেছিল,

—শুনেছি কাকাবাবু তাঁর মালিকের কারখানায় প্রথম ঢুকেছিলেন

মিস্ত্রি হয়ে।

আমার দৃঢ় ধারণা বুঝলে শিশির, তোমাদের সাইকোলজিতে যাকে বলে, কাকাবাবু সরলের ভেতর ওঁর নিজের ইমেজ দেখতে পেয়েছিলেন। মানুষ নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে ভালোবাসে। ওটা মানুষের একধরনের দুর্বলতা। আর ঐ দুর্বলতার ছিদ্রপথে সরলও তার গরীব মামাদের সংসার থেকে কাকাবাবুর সংসারে জায়গা পেয়ে গিয়েছিল। সুমিতার সঙ্গে মেশবার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কাকাবাবুর এমন ডানহাত হয়ে উঠেছিল যে কাকাবাবু তাকে তাঁর সম্পত্তির ভাগ পর্যন্ত…

কি জানো শিশির!

ত্রিদিবের চোয়াল কঠিন হয়ে উঠেছিল।

—সুমিতার সঙ্গে যে ওর কি রকম ঘনিষ্ঠতা সে তুমি ধারণাই করতে পারবে না। সুমিতা একেবারে ওর কাঁধের ওপর হাত রেখে ঢলে ঢলে পড়ে নানারকম আব্দার করবে। বাড়িতে এত লোকজন রয়েছে অথচ ওর সব আব্দার ওই সরলের কাছে। 'সরলদা এই উলের শেড্ তোমায় আনতে বলেছি বুঝি, মোটেই না। অন্য শেড্ বলেছিলাম। তারপর এত সব করে যে উল আনায়…

শিশির বাধা দিয়ে বলেছিল,

—তাতে তোমাকেই পুলওভার বুনে দেয়, তাই না?

—না ঠিক তা নয়, সুমিতা বুনে দেয় আমাকে আর নিভা বুনে দেয় সরলকে।

—ত্রিদিবের মুখের রেখায় রেখায় যে ঘোর ভালোবাসা আর ভালোবাসা সঞ্জাত অবিশ্বাস ফুটে উঠতে দেখেছিল শিশির সে কথা মনে করে একা ঘরে বসে বসে শিশির অনেক হাসল। প্রেম জিনিসটা ভারি 'ফানি' মনে মনে ভাবল শিশির। অথচ নিজে করলে সিরিয়াস কিন্তু অন্যেরটা দেখে দারুণ হাসি পেয়ে যায়।

তারপর শিশিরকে তার আসল বক্তব্য, আসল ভয়ের কারণগুলো খুলে

বলেছিল ত্রিদিব। ত্রিদিব তার এই ভয় আর সন্দেহের কথা একমাত্র রায়বাড়ির রানী পিসিমা ছাড়া আর কাউকে খুলে বলে নি। সে বলেছিল—আমি বুঝতে পারছি যে সরল সুমিতাকে খুন করার চেষ্টা করছে। আমি পর পর তোমাকে তিনটি ঘটনা বলে যাবো। ঘটনা তিনটি শোনার পর তুমি তোমার রায় দেবে। তোমার যা সত্যি মনে হয় তাই বলবে। যেমন রাণী পিসিমা বলেছিলেন। কারণ তুমিও ত আমার বন্ধু। তারপর ত্রিদিব তিনটি ঘটনা বলে গিয়েছিল শিশিরকে।

প্রথম ঘটনাটি ঘটেছিল রায় বাহাদুর নিশানাথ রায়ের মৃত্যুর ঠিক পরেই। তখনো ত্রিদিব চাকরি ছাড়ে নি। সরলও শোক কাটিয়ে উঠতে পারে নি। সুমিতা সারাটা দিন গুম্ হয়ে পড়ে থাকত নিজের ঘরে। রানী পিসিমা আর নিভাই শুধু সমস্ত শোক অন্ততঃ বাইরে বাইরে ঝেড়ে ফেলে বাড়ির সবাইকে প্রফুল্ল করবার চেষ্টা করছে। ঝিমোনো ঝিমোনো শোকের পরিবেশ কাটানোর জন্যে রানী পিসিমা ভাবছেন দার্জিলিং বেড়িয়ে এলে হয়, নিভা কয়েকজন সংগীত শিল্পি ডেকে বাড়িতে একটা ঘরোয়া জলসা করার আয়োজন করছে এমন সময় সেই মারাত্মক কথা উঠল।

কথাটা হল 'মাশরুম' খাওয়ার ব্যাপারে। সরলকে নিশানাথ ওয়েসট্ জার্মানীতে একটা টেক্‌নিকাল ট্রেনিং-এর জন্য পাঠিয়েছিলেন। সেখান থেকে সরল ট্রেনিংও নিয়েছিল আর জার্মান বন্ধু-বান্ধবীদের কাছ থেকে বেশ কয়েক রকম রান্না শিখে এসেছিল। সুমিতাকে খুশি রাখার জন্য তখন যাহোক একটা কিছু ছুতো করে রায়বাড়িতে উৎসব তৈরী করা হ'ত। সরল তারই সুযোগ নিয়েছিল। সরলের হাতে তৈরী মাশরুম্ কারি আগেও অনেকবারই খেয়েছে সুমিতা। সে খুব ভলোবাসত খেতে। সেদিন সরলই কথাটা তুলেছিল। বলেছিল,

—সুমিতা এসো, আজ বাড়িতেই একটা দারুন মিছিমিছি পিক্‌নিক্ করা যাক। নিভা কাগজ পেনসিল্ নিয়ে বসো··· সঙ্গে সঙ্গে নিভা আর

সরল ফর্দ বানিয়ে ফেলেছিল। ওরা নিউমার্কেটে যাবে। সব নিয়ে আসবে নিজেরা বাছাই করে। সরল সেদিন অফিস যায় নি। আর ত্রিদিব সমস্ত ব্যাপারটাই চুপচাপ দেখে যাচ্ছিল আর রাগে ফুলছিল। কারণ সরল যেন ইচ্ছে করেই আলোচনায় ত্রিদিবকে ডাকে নি বা ত্রিদিবের কোনো রকম মতামত নেয় নি। সারাদিন ধরে লেবরেটরিতে কাজ করেছে ত্রিদিব আর কাজ করতে গিয়ে কেবলই অন্যমনস্ক হয়ে ভুল করেছে।

ফিরে এসে মাশরুম্ রান্না হয়েছে শুনে সে কেমন যেন ক্ষেপে গিয়েছিল। ছুটে নেমে গিয়েছিল কিচেনে। সে খেতে পারবে না বলে সুমিতা খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারটা ঠেলে দিয়েছিল রাত্রে।

কিচেনে নেমে গিয়ে রেফ্রিজারেটর খুলে সব রান্নার চেহারা রঙ্ সম্বন্ধে যেন নিজে থেকেই সরেজমীন তদন্ত করে এসেছিল ত্রিদিব। 'মাশরুমে'র রংটা কেমন ঝুল কালো। ওপরে উঠে এসে সুমিতাকে অনুরোধ করেছিল, যেন সুমিতা অন্ততঃ 'মাশরুমে'র কারিটা না খায়। কারণ জিনিষটাকে বিষের মত লেগেছিল তার। কিন্তু সন্ধেবেলা বাইরে বাগানে হাল্কা টেবিল চেয়ার পড়ল। টেবিলে টেবিলে আলো দেওয়া হল। আর তারপর যা হয় ঠিক তাই। এই মাশরুমের কারিটাই সুমিতা যেন জিদ করে বেশি খেল। তারপর রাত্রি থেকে তার শরীরে শুরু হলো বিষক্রিয়া। সুমিতাকে সেরে ওঠার পরও প্রায় দিন কুড়ি নার্সিং হোমে থাকতে হয়েছিল।

দ্বিতীয়টি রায়বাড়ির চারতলা পুড়ে যাওয়ার ঘটনা। নিশানাথ রায় বেঁচে থাকতে থাকতেই রায়বাড়ির তিনতলার ছাদ জুড়ে সুমিতার জন্য আলাদা একটি মহল তুলেছিলেন। একেবারে অতি আধুনিক কেতায়। সুমিতা অদুর ভবিষ্যতে বিয়ের পরেও যাতে বাবার কাছে থাকতে পারে, তারই জন্য তাঁর এত যত্ন। নার্সিং হোম থেকে ফিরেই সুমিতা বায়না ধরেছিল চারতলার নতুন মহলে গিয়ে থাকবে সে। বাবার স্মৃতির ছায়া রায়বাড়ির নীচের তলার বাতাসকে ভারি করে রেখেছে। কিছুতেই

পুরোনো তিনতলায় থাকবে না সে। ত্রিদিবের ধারণা নার্সিং হোমে গিয়ে নিশ্চয়ই সরল তাকে রোজ জপাত ওই চারতলায় গিয়ে থাকার জন্য। সুমিতা নার্সিং হোম থেকে ফিরে এসেই চারতলায় উঠল। চারতলার সমস্ত কিছুই তখন কমপ্লিট্ শুধু সিঁড়িটা তৈরী হয় নি। চারতলাটাকে বাড়ি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেবার জন্য তিনতলার সিঁড়ি দিয়ে ছাদে যাবার রাস্তাটা বন্ধ করে দিয়ে ভবিষ্যতে বাইরে থেকে চওড়া সুন্দর একটা সিঁড়ি, সিঁড়ির ল্যাণ্ডিংএ ল্যাণ্ডিংএ একটি করে ঘর তোলার কথা ছিল। সুমিতার আব্দারে কোনো রকমে কাজ চালানোর মত একটা সিঁড়ি তৈরী হয়েছিল। সেটার সংগে বাড়ির দোতালার একটা যোগ ছিল মাত্র।

সুমিতা যখন চারতলায় থাকতে গেল, তখন ঠিক আগের মতই ত্রিদিবের কেমন যেন দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে হয় সুমিতাকে ছাদ থেকে ফেলে দেওয়া হবে, নাহলে চারতলায় আগুন লাগিয়ে সুমিতাকে পুড়িয়ে মারা হবে। যেদিন রাত্রে সুমিতা চারতলায় থাকতে গেল, ঠিক সেই রাত্রেই আগুন লাগল চারতলায়। অতিকষ্টে দমকলের লোকদের সাহায্য নিয়ে ত্রিদিব তাকে বাঁচিয়েছিল।

তৃতীয় ঘটনাটি ঘটেছিল দার্জিলিঙে।

জলাপাহাড়ে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিল সরল সুমিতাকে ত্রিদিবের অমতে। সুমিতাকে একটা উঁচু জায়গা থেকে ফেলে দেয় সরল। সুমিতা যখন পড়ে যাচ্ছিল তখন ত্রিদিবই তাকে টেনে ধরে বাঁচায়।

তিনটি কাহিনী বলার পর আশাভরা চোখে ত্রিদিব তাকিয়েছিল শিশি-রের দিকে।

—বলো শিশির. তোমার ফ্র্যাঙ্ক ওপিনিয়ন দাও।

বলো ত, ব্যাপারগুলো কি তোমার ডেলিবারেট্ মনে হচ্ছে? না নিছক এ্যাক্সিডেণ্ট মনে হচ্ছে?

শিশির খানিকক্ষণ চুপ করে ছিল। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলেছিল, 'তুমি

একেবারেই জমিয়ে গল্প বলতে পারো না ত্রিদিব।
তারপর একটু ভেবে বলেছিল,
—তবে, তোমার কথা শুনে ত আমার এ্যাক্সিডেনট্ বলেই মনে হচ্ছে। তোমার রানী পিসিমাও অবশ্য এ্যাক্সিডেনট্ ভেবেছেন। তবে আমার যে কারণে এ্যাক্সিডেনট্ বলে মনে হচ্ছে⋯
ত্রিদিব বলে উঠল,
—কারণ থাকলেই ত বুঝতে হবে ব্যাপারটা ডেলিবারেট। তাই না?
শিশির হাসল,
—কি বলব বলো। আমার সম্বল ত শুধু তোমার বলা ঐ ব্যাড্‌লি টোল্ড গল্পগুলো। আর রানী পিসিমা একেবারে ওই আবহাওয়ার মধ্যেই রয়েছেন। ঠিক জলের ভিতরে মাছের মত।
শিশির ত্রিদিবকে প্রশ্ন করেছিল,
—আচ্ছা ত্রিদিব তুমি অ্যাকচুয়ালি কি চাও বলো ত? ত্রিদিব নিজের মাথার অবিন্যস্ত কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলিতে আঙুল চালাতে চালাতে বলেছিল,
—আমি চাই যে কোন মূল্যে, তা সে রায়বাড়ির সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির মূল্যেই হোক, সুমিতাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে, আর নিজেকে হত্যার অপরাধের দায় থেকে বাঁচাতে। আর তাও যদি না পারি শিশির, আমি তোমাকে সাক্ষী রাখতে চাই। যাতে তুমি আমার বা সুমিতার ভালোমন্দ কিছু একটা ঘটার পরও সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারো।
অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর শিশির উঠে দাঁড়াল। তার মাথার ভিতরটা ঝাঁঝাঁ করে জ্বলছে। গায়ে র‍্যাপারটা জড়িয়ে নিয়ে নিজের ঘরের দরজায় চাবি দিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ল শিশির। তখন মধ্য-রাত্রি। রাস্তায় শুধু শূন্যতা আর শীত।
শিশির একা ঘুরে ঘুরে পার্ক প্রদক্ষিণ করে এল। আস্তে আস্তে রায়-

বাড়ির সমস্যা চাপা পড়ে গেল তার মনের ভিতর। উঠে এল কবিতার কয়েকটা ধোঁয়াটে আইডিয়া। মনের মধ্যে সেই সূত্রগুলো নিয়ে খেলা করতে করতে শিশির বাড়ি ফিরে এল।

শিশিরের সংগে ত্রিদিবের দেখা করার কথা ছিল পরদিন বিকেলে। ঢাকুরিয়া লেকের লিলিপুলে এসে বসল দু'জনে।

ত্রিদিব বলল,

— তুমি কিছুতেই কোনো রেস্তোঁরায় যেতে চাওনা কেন? বলো ত শিশির।

শিশির হেসে বলল,

—আমার ইনকাম্ জানো ত? ওটাই আমার পক্ষে একটা ঘোড়া-রোগ।

ত্রিদিব নীল আকাশের উজ্জ্বলতার দিকে তাকিয়ে বলল,

—এ একরকম বেশ হ'ল। কতদিন এই ভাবে বাইরের জগতটাকে দেখা হয় নি। যাই হোক্ একটা কথা তোমায় বলি শিশির। কালকে বাড়ি গিয়ে অনেক দিন পরে আমি খুব ভালো করে ঘুমিয়েছি।

—শিশির একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল,

—কাল তোমার ব্যাপারটা নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। কিন্তু সত্যি-কথা বলতে কি অতগুলো নতুন মানুষ, নতুন নাম, রানী পিসিমা, নিভা, সরল, সুমিতা, এদের কাউকে চোখেও দেখি নি ভালো করে এদের কারো বিষয়ে জানিও না। এই হল ঝামেলা,

অদ্ভুত খুশি হয়ে উঠল ত্রিদিব। একজন নির্বান্ধব একা মানুষের পক্ষে একটি বন্ধু পাওয়া অনেকখানি বড় কথা।

সে পরম উৎসাহে বলল,

—চলো না শিশির, আজই আমার সঙ্গে রায়বাড়ি চলো। সকলের সঙ্গে আলাপ করে নেবে।

শিশির হাসল। তার সেই স্বভাব সিদ্ধ লাজুক হাসি।

—আমি আবার কবে আলাপটালাপ করতে শিখলাম। স্মার্ট বলতে আমার কোনো সুনাম টুনাম নেই। বরং তোমার নিজের আরো দু' চার জন বন্ধুকে ডাকো না! সেই সঙ্গে আমাকে।

ত্রিদিব বলল,

—না না, একদিন নয় শিশির। আমার মনে হচ্ছে খুব শিগগিরই ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটবে। ঘটার আগেই সব বন্ধ করে দিতে চাই। কালই রায়বাড়িতে চায়ে ডাকি তোমাদের। আর তাছাড়া···ঠিক আছে আর একটা প্ল্যান মাথায় এসেছে আমার····

শিশির জিজ্ঞাসু চোখে চাইল।

—এবার সরস্বতী পূজোর সময় সুমিতারা বম্বে যাচ্ছে না বোধহয়। দেশে মানে এবার দেউলচাঁপায় যাবার কথা আছে। তখন একা একা সরলের সঙ্গে থাকার কথা ভেবে আমি খুব আতঙ্কের মধ্যে ছিলাম। তুমি যদি আমাদের সঙ্গে এবার দেউলচাঁপায় যাও, ব্যাপারটা কিন্তু মন্দ হয় না। এমনকি ধরো সুমিতার ওপর ওখানে যদি কোনো এ্যাটেম্‌পট হয় তাহলে তুমি আর আমি দু জনে মিলে হয়ত সুমিতাকে বাঁচাতে পারব। যদি নাই ই পারি অন্ততঃ আমাকেও খুনের দায় থেকে বাঁচাতে পারবে তুমি।

শিশির বলল,

—তুমি সব সময়েই বড় বেশি এ্যাড্‌ভানস্‌ সব ভেবে রাখো দেখছি। দেখো অতসব সিরিয়াস ব্যাপার কিছুই ঘটবে না। সব কিছুই খুব সহজ, একেবারে জলের মতন হয়ে যাবে।

রায়বাড়িতে আজ অতিথিরা আসবেন।

ভিতরে মখমলের ডিভানে বসে রানী পিসিমা নরম শ্যাময় লেদার দিয়ে কারুকার্য করা রূপোর চামচগুলো ঘষে ঘষে পরিষ্কার করছিলেন। তাঁর রূপালী কালো চুলের রাশি শাদা থানের ঘোমটার ফাঁক দিয়ে কাঁধ

ছাপিয়ে নীচে নেমেছে।

নিভা আর সুমিতা তাঁর কাছে দুটি মখমলের 'পুফে' টেনে নিয়ে বসে পড়ল। দুজনের মুখেই দুষ্টুমির হাসি।

নিভা বলল,

--রানী পিসিমা খালি ত্রিদিবদাকে খুশি করতেই ব্যস্ত। কেন সবলদাও তো বাড়িতে আছে।

রানী পিসিমা চোখ তুলে ওদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন,

—কেন সবলকে আবার কি কুচোখে দেখলাম আমি। আজ ত্রিদিবের বন্ধুরা আসবে। তারা ত কুটো নেড়ে দুটো করবি নে। তা আমিই একটু করি।

সুমিতা বলল,

—ত্রিদিবদা ত পাগল হয়ে গেছেন। এই শীতে বাগানে রঙিন ছাতা বসিয়ে টেবিল সাজিয়ে লাভটা কি?

—নিভা বলল,

—আর এত স্বার্থপর। আমাদের বন্ধুদের কিছুতেই বলতে দিল না।

রানী পিসিমা ওদের কথার কোনো উত্তর না দিয়ে হাসতে লাগলেন।

সুমিতা বলল,

—সাহায্য চাইলে কি আর আমরা সাহায্য করতাম না? ইতিমধ্যে কখন ত্রিদিব ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। অমনি নিভা আর সুমিতা দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে কুলকুল করে হেসে উঠল।

ত্রিদিব গম্ভীর হয়ে রানী পিসিমার পাশে এসে বসল।

সুমিতার মুখের দিকে তাকাল না সে। পায়ের রঙিন নখে সে মেঝেতে পাতা পুরু কার্পেটের একটা ফুল খুঁটছিল।

সুমিতার চোখ দুটি ঘোর আর নিবিড় খয়েরী। অমন রঙেরও একটা আলাদা শোভা আছে। একটু বন্য আর একটু রহস্য মাখা। ফিকে বাসন্তী রঙের ঢাকাই জামদানি বুটি তোলা শাড়িটি ওর ছিপ্‌ছিপে শরীর

টি'তে জড়ানো। দু'একটি সোণার গয়না কানে গলায় ঝিক্‌মিক্‌ করছে। তাদের কারু-কাজগুলিও ত্রিদিব ভালো করে খুঁটিয়ে দেখে নি। সুমিতা সবটা মিলিয়ে এমন একটা ব্যাপার, লাল্‌চে ঠোঁট, নরম স্নিগ্ধ একটি রঙ, গালের তিল সব মিলিয়ে এত আকর্ষণের। তাকালেই ত্রিদিবের ভিতরটা পুড়ে যায়।

আর সেই সুমিতাই কিনা সব সময়েই তার আশে পাশে। কাছে। ত্রিদিবের মাঝে মাঝে মনে হত সুমিতার সঙ্গে যদি তার আরো অনেক অনেক কম দেখা হ'ত তাহ'লেই যেন বেশ ভালো হ'ত।

নিভা বলল,

—কি ত্রিদিবদা অত রাগ কেন ?

ত্রিদিব বলল,

—রাগ আবার কি, আমার বন্ধুরা আসবে, তোমাদের একটুও উৎসাহ দেখছিনে। অথচ এর আগে কত বার ওদের গল্প শুনে বলেছ, নিয়ে এসো না তোমার বন্ধুদের দেখব !

রানী পিসিমা চোখ তুলে বললেন,

—তুমি সেই অশোক হালদারকে আসতে বলেছ ত্রিদিব। যে রাস্তায় ঘাটে ট্রামে-বাসে হেঁড়ে গলায় নিজের লেখা কবিতা পড়ে।

ত্রিদিব বলল,

—নিশ্চয়ই। অশোক না হ'লে কখনো আসর জমে ?

—আর শ্যামল পাল ?

নিভা প্রশ্ন করল,

—যে ন্যাশানাল লাইব্রেরীতে এক মোটা মহিলার হাত থেকে তাঁর বাক্স-শুদ্ধ সব টিফিন কেড়ে খেয়ে নিয়েছিল। তারপর বলেছিল, আঃ আপনি ত আমাকে খুব পেট ভরে খাওয়ালেন, এখন আমি আপনাকে এই খাওয়ানোর শোধ দিই একটু এনটার্‌টেন করে, বলে ভালুকনাচ দেখিয়ে দিল।

—আর সেই সুধী বিশ্বাস ?

সুমিতা বলেছিল,

যে ফুটপাথে পেনটিং নিলাম করে দেয়, বড় দাড়ি কামিয়ে জমিয়ে রাখে বিদেশে চালান করবে বলে।

ত্রিদিব বলল,

—ঠাট্টা করলে কি হবে ? ওদের ভেতর লাইফ্ আছে বুঝলে। তোমাদের বন্ধুদের মত না, যে দিনরাত রূপচর্চা করছে আর সিনেমা যাচ্ছে। কিম্বা সরলের সেই গালগলা ফোলা গম্ভীর বন্ধুগুলোর মত দিনরাত স্ক্রুপ্ পেরেক আর 'জ'-র মাপ কষছে।

ইতিমধ্যে সরল এসে ঢুকল,

—হ্যা ত্রিদিব ঠিকই বলেছে। আমার বন্ধুরা যখন আসবে তখন তাদের প্লেটে করে স্ক্রুপ্ আর পেরেক দিও বাপু, ত্রিদিবের বন্ধুদের কিন্তু গ্লাশ গ্লাশ চাঁদের আলো আর প্লেট প্লেট ফুলের পাপড়ি খাওয়াতে হবে। নাহলেই সর্বনাশ !

ত্রিদিব রাগত চোখে তাকাতেই সরল হেসে বলল,

—বাঃ আমি ত তোমার হয়েই বলছি। রাগ করছ কেন ? এই, যাও ওঠো দু'জনে, নাহলে মাথা ঠুকে দেবো। ত্রিদিবের বন্ধুদের ভালো করে রিসিভ্ না করলে তোমাদেরই ত নিন্দে !

নিভা গালে হাত দিয়ে বলল,

—ইসস্ ভেবে দেখিনি ত একেবারে, সত্যিই ত! চলো সুমিতা দরকার নেই আমরা ত্রিদিবদার সঙ্গে কো-অপারেট করিগে।

সুমিতা হেসে বলল—চলো ত্রিদিব দা।

ত্রিদিব সবিস্ময়ে দেখল সরলের সামান্য একটা কথায় কেমন চমৎকার কাজ হয়। এত সহজে সরল নিভা আর সুমিতাকে হাত করে নিতে পারল দেখে ক্রোধে ত্রিদিবের সর্বাঙ্গ একেবারে জ্বলে যেতে লাগল।

সুমিতা আর নিভা সরলকে নিয়ে একতলার বড় হলঘরে চলল। সেখানে

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুমিতা আর নিভার তৎপরতা দেখতে দেখতে কেবল সরলের মুখটা মনের মধ্যে উদয় হয়ে ছন্দভঙ্গ ঘটাতে লাগল ত্রিদিবের। সরলের বদলে ও আজকাল ওর ঘাড়েব ওপর বসিয়ে রাখা একটা চতুর জানোয়ারের মুখ দেখতে পায়। তাই ও কালকে শিশিরকে বলছিল, সরল আসলে একা এই বাড়ি ঘর বিষয় সম্পত্তি সব ভোগ করতে চায়। তা করুক ত্রিদিবেব কোনো তুঃখ নেই। সে না হয় নিজে থেকেই সব ছেড়ে দিয়ে চলে যেত। যদি সরল সুমিতাকে বাঁচিয়ে রেখে, সুমিতাকে নিয়ে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি ভোগ কবত। কিন্তু সুমিতাকে যে সবল খুন করতে চায়।

সুমিতা আব নিভা পাশাপাশি মাথা নীচু করে বসে আগে থেকে লুকিয়ে কিনে রাখা কেক আব পেস্ট্রী সাজাচ্ছিল বড় বড় কাচের প্লেটে। এক জনেব পরণে পাৎলা হলুদ রঙের জামদানী শাড়ি আর একজনের লাল টুকটুকে তাঁতের শাড়ি। তুজনেরই গায়েব রঙ ফরসা। মুখ নামিয়ে রাখলে প্রায় তু'টি বোনের মত মনে হয়। অথচ নিভাও—ত্রিদিব আর সরলেব মতই প্রায়। এবাড়িব সঙ্গে নিঃসম্পর্কিতা—সুমিতার মাইনে করা সঙ্গিনী।

আচ্ছা এই সুমিতা, নিভা, রানী পিসিমা এদের কারো কি এতটুকুও সন্দেহ হয় না যে সরলের মধ্যে একটা চতুর খুনী লুকিয়ে আছে ?.... হয়না। আশ্চর্য! ত্রিদিবই শুধু বিনা কারণে ভেবে মরছে।

যাক্ আজ শিশিররা সবাই আসছে। ওদের যে কজনকে পেরেছে ফোনে যোগাযোগ করেছে ত্রিদিব। এখন শুধু সঙ্কোচ হচ্ছে ওর নিজের নতুন পরিচয়টা ওদের কাছে দিতে। হঠাৎ আজ সন্ধ্যেবেলা ওরা জানবে যে ত্রিদিবের অবস্থার পরিবর্তন হয়ে গেছে।

বড় হলঘরের ঘড়িতে পিয়ানোর মত ঘড়িতে টুং টাং করে পাঁচটা বাজল। ত্রিদিব আস্তে আস্তে সামনের শ্বেতপাথরের টেবিলের ধারে রাখা বেল-জিয়ান মিরারটার সামনে এসে নিজের মুখোমুখি দাঁড়াল। কাকাবাবু

নিজে বড়মানুষ ছিলেন না বলেই বোধ হয় বড়মানুষ, বিশেষ করে বনেদি বড়মানুষদের, প্রাণপণে নকল করতে চাইতেন। তাই কোন এক পড়্‌তি রাজবাড়ি থেকে এই চারপাশে সোণালী লতাপাতা কাটা ফ্রেম লাগানো বড়লোকদের মানুষ-প্রমাণ আয়নাখানা কিনেছিলেন।

ত্রিদিব সেই আয়নায় তার নিজের চেহারাটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল।

এমন ভাবে, যে ভাবে বন্ধুরা তাকে দেখবে।

নিজের ঘরে বসেছিল শিশির। দাদার বাড়ির এই ঘরটার একটা সবচেয়ে বড় সুবিধে হ'ল এর বাইরের দিকে একটা দরজা আছে বলে ঘরটাকে একেবারে নিজের ঘরের মত করে ব্যবহার করা যায়।

জানালা দিয়ে হলদে রঙের খানিকটা রোদ এসে পড়েছে। রোদের মধ্যে ধূলোর ছটফটে কণাগুলো খেলে খেলে বেড়াচ্ছে। ঘরে তেমন আলো আসে না বলেই রোদের ধারাটা এমন উজ্জ্বল। পাশে বড় বড় পাথরের চাঁই বসানো গলিটায় বস্তির ছেলেদের খেলার শব্দ। একটা বহু দিন আগে পোঁতা রট্ আয়রনের কারুকার্য করা গ্যাস্‌পোষ্ট। শিশির এ গলিতে আসার পর সেটাকে কোনো দিন জ্বলতে দেখে নি। গলির বাঁকটা যেখানে গিয়ে বড় রাস্তার সংগে মিশেছে কেবল সেখানে লম্বা ঝোলানো তার থেকে একটা ডোম ঝোলে। শিশির এপাড়ার অনেক পুরোনো বাসিন্দাকে প্রশ্ন করেছে, তারা কেউই ঠিক করে বলতে পারেন নি আদৌ, কোনোদিন এই স্ট্যাণ্ডের ওপর গ্যাসের বাতি জ্বলত কি না। আর একটা রাস্তার আসবাব আসতে যেতে খুব ভালো লাগত শিশিরের, সেটা হল এই রাস্তারই অন্য মুখে একটা সিংহমুখ কর্পো-রেশনের কলের শরীর। সিংহমুখ দিয়ে সারাটা দিনই ঝিরঝির করে জল পড়ত।

শিশির আজ তিন-চারদিন হল কোনো কিছুই লিখতে পারছে না। কলেজে ক্লাশ নিতেও তার মন নেই। অভ্যস্ত জীবন থেকে সে কেমন যেন সরে এসেছে। সকাল সন্ধ্যা সে বেশ এদিকে ওদিকে বেড়িয়ে বেড়াত, মাঝে মাঝে কলেজ স্ট্রীটে কিম্বা ময়দানে যেত, কখনো বা বন্ধু-দের আড্ডায় বসে বসে তাদের আবেগের ভেজাল ধরবার জন্য চিন্তার ল্যাক্‌টোমিটার ডোবাত। এখন আর সে সব করে না। কিছুদিন হল ত্রিদিব আর ত্রিদিবের রায়বাড়ি তাকে একেবারে পেয়ে বসেছে। কাল ত্রিদিবের রায়বাড়িতে তার চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল। শিশির গিয়েছিল যেন একটা অদৃশ্য টেপ্‌রেকর্ডার নিয়ে। আজ সারাদিন সে সেই টেপ্‌-রেকর্ডারটাই যেন ফিরে ফিরে বাজিয়ে রায়বাড়ি থেকে তুলে আনা সংলাপের স্রোতের ঢেউ গুণছে। মনে মনে বাজাতে বাজাতে যেখানে যেখানে আবার ফিরে শুনতে ইচ্ছে করছে, সেইখানগুলি ফিরে বাজা-চ্ছিল শিশির। দরকার মত থামিয়ে থামিয়ে।

কাল ত্রিদিবের অন্য বন্ধুরা চলে যাবার পরও শিশির ছিল।

প্রথম দিকের আলাপ আলোচনা পেরিয়ে টেপ্‌রেকর্ডারটা দ্রুত চালিয়ে দিয়ে শিশির দরকারী জায়গাটার কাছে এসে ভালো করে শুনতে লাগল।

সরল শিশিরকে রানী পিসিমার কাছে নিয়ে এল। রানী পিসিমা কোণের দিকে একটা সোফায় বসেছিলেন।

সরল—রানী পিসিমা, এই যে, ইনিই শিশিরবাবু। ত্রিদিবের খুব বন্ধু। মেসে থাকত ওরা এক সঙ্গে।

রানী পিসিমা—[স্নেহপূর্ণ সুরে] বোসো বাবা, আমার পাশের এই সোফাটায় বসো। সুমিতা আর নিভার সঙ্গে নিশ্চয় পরিচয় হয়েছে।

ত্রিদিব—হ্যাঁ, হয়েছে। ওরা ত শিশিরকে দিয়ে ইনস্ট্যান্ট্‌ কবিতা লেখাতে চায়।

ত্রিদিব দ্রুতগতিতে তার মনের টেপ্ রেকর্ডারের গতি বাড়িয়ে দিল। যত সব অদরকারী ফরমালিটি। ও আরো ভিতরের কথায় যেতে চায়। ঘণ্টাখানেক বাদে সরল উঠে যাবার পর যখন সুমিতা আবার সেই পুরোনো ঘটনাগুলো নিয়ে তোলাপাড়া শুরু করল তখন ত্রিদিব তাকে থামাবার চেষ্টা করতে লাগল। সেইখান থেকে শিশির আবার ফিরে বাজাতে শুরু করল।

সুমিতা—না ত্রিদিবদা তুমি আর আমাকে সব সময় তুলোর ভিতর আঙুরের মত করে সন্তর্পণে রাখতে পারবে না। শিশির-বাবুকে আমি ঘটনাটা বলবই।

ত্রিদিব—[মুখভাব কঠিন করে] যদি বলি তোমার আর বেশি করে বলবার দবকার নেই। আমি অলরেডি বলেছি শিশিরকে সব।

[রানী পিসিমা একটু যেন চমকে উঠলেন]

রানী পিসিমা—সত্যি ত্রিদিবকে নিয়ে আর পারা গেল না। কোথায় কোথায় গিয়ে কি যে সব বলে আসে!

ত্রিদিব—না রানী পিসিমা, আমি শিশিরকে ছাড়া আর কাউকে কিছু বলি নি।

সুমিতা—এর আর বলবার কি আছে? ত্রিদিবদা সব বিষয়ে এত বাড়া-বাড়ি করে।

ত্রিদিব—বাঃ আমার বাড়াবাড়িটাই শুধু দেখলে আর তোমার শক্-লাগাগুলো বুঝি মিথ্যে!

সুমিতা—[সহাস্যে] বাঃ রে মিথ্যে হবে কেন? এ্যাক্সিডেন্টে হলে শক্ ত লাগবেই। তার আর আশ্চর্যের কি আছে।

[ইতিমধ্যে সরল এসে ঢুকল।]

সুমিতা—শুনুন শিশির বাবু, খুব মজার ঘটনা। আমাকে, আমাদের ত্রিদিবদার মতে বিষ খাওয়ানোর অপচেষ্টা।

সরল—না তুমি, ও গল্প আমি তোমায় বলতে দেব না। ওটা প্রায় আমারই গল্প। আমিই ত প্রায় নায়ক গল্পটার।

সুমিতা—না সরলদা, আমি!

রানী পিসিমা—এই তোরা খুনসুটি করছিস্ কেন বলত? বলতে হয়, যে কোনো একজন বলেই দে না।

[ত্রিদিব উঠে দাঁড়িয়ে একটু ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সে হয়ত সরল আর সুমিতার ওই মিষ্টি মিষ্টি কথা কাটাকাটি নয়ত গল্প বলার ব্যাপারটাই তেমন পছন্দ করছিল না।]

সরল—[পাশে বসা শিশিরের বাহু ছুঁয়ে অন্তরঙ্গ সুরে] জানেন শিশির-বাবু, কাকাবাবু ত আমাকে ওয়েস্ট জার্মানীতে ট্রেনিং-এ পাঠিয়েছিলেন। ওখানে আমার রুমমেট্ ছিল স্যামুএল্‌স্। সব সময়েই মাতাল হয়ে থাকত। ফলে আমাকেই ওর সব রকমের দেখাশুনো করতে হ'ত। মাঝে মাঝে রান্না বান্না করে খাওয়াতেও হ'ত। পাশের ফ্ল্যাটলেট্-এ ছিল একজন নার্স। নাম ভেরা, ও আমাকে দু' চার রকম অল্প আয়াসে বানানো যায় এমনি রান্না শিখিয়েছিল। তার মধ্যে মাশরূম কারি অন্যতম।

রানী পিসিমা—[হাসতে হাসতে] বাবা তোরা ত খুব ইংরিজিতে গাল-ভরা করে মাশরূম কারি বলছিস। ওয়েস্ট জার্মানীতে কেন আমাদের গাঁয়েতেও ওগুলো হয়। ওগুলোকে আমাদের দেশে ঘরে 'ছাতু' বলে। ছোটবেলায় কত খেয়েছি। দেখতে ঠিক পাঁউরুটির মত। মা রান্না করতেন খুব ঝাল ঝাল করে। পিস্ পিস্ করে কেটে দিতেন, খেতে ঠিক চিংড়িমাছের মত লাগত।

ত্রিদিব—[জানালার ধার থেকে, বাইরের দিকে তাকিয়ে] হ্যাঁ হাই প্রোটিন। স্যপ্রোফাইট্ কি না। হয় খুব কম সময়ে,

বাড়ে দ্রুত। চাষে কোনো খরচ নেই। এমনকি জমিও দরকার হয় না কখনো কখনো। পচা খড়ের ওপরই দিব্যি বোনা যায়। বছর খানেক আগে একটা সেমিনার হয়ে গেল ওই ফাঙ্গাসের ওপব। বিদেশে ওরা ত ফুড হিসেবে দারুন পপুলারাইজ করে ফেলেছে ফাঙ্গাসকে, এদেশেও এখন চেষ্টা চলছে।

সুমিতা—বাঃ! চমৎকার লেকচার দিলে ত্রিদিব দা। কিন্তু লেকচারের শেষ লাইনে, অর্থাৎ মুখবন্ধে ও নির্ঘাৎ বলবে, 'কিন্তু সাধু-সাবধান' ইহা অতীব বিষাক্ত!

ত্রিদিব—[ঝেঁঝে উঠে] নিশ্চয়ই। নয়ই বা কেন? যেমন হাই প্রোটিন, তেমনি কখনো কখনো না চিনে খেলে হাইলি পয়জনাস। রানী পিসিমাই এর সাক্ষী দেবেন। বলুন রানী পিসিমা আপনার সেই ছোটবেলার গল্প।

রানী পিসিমা—[কিছুটা সিরিয়াস, আবার কিছুটা প্রশ্রয়ের ভংগিতে] তা বাপু সত্যি কথা। ছোটবেলায় দেখেছি ওই ছাতু বাছবিচার করে না খেয়ে আমাদের গাঁয়ের বাগ্দি বৌ মরে গিয়েছিল।

ত্রিদিব—[বিরক্ত কণ্ঠে] তা, যে জিনিস অত বাছবিচার করে খেতে হয়। সে জিনিষ খাওয়াই বা কেন? অদ্ভুত সব শখ।

সুমিতা—[ছদ্ম কলহের সুরে] যেহেতু তা অত্যন্ত মুখরোচক, যেহেতু সরলদা এর আগেও অনেকবার খাইয়েছে, আমাদের কোনো অসুখ হয় নি, আর তা ছাড়া ওই মাশরূমের কারি খেয়েই যে আমার অসুখ করেছিল তারই বা কি প্রমাণ আছে?

সরল—[ক্লান্ত কণ্ঠে] তুমি তোমার ওই মেয়েলি কলাকলানি থামাও ত সুমি! লক্ষ্মি! আমাকে বলতে দাও।

তারপর জানেন শিশিববাবু, তখন বাড়িতে শোকের একটা গম্ভীর আবহাওয়া থাকায় আমরা সব ভুলে থাকার জন্য নিজেদের খুশি রাখার জন্য নানান রকম চেষ্টাই বলুন আর অপচেষ্টাই বলুন করে যেতাম। যেমন

একটা ঘরোয়া পিক্‌নিক। এই আজকের মত। কয়েকজনকে নিয়ে একটু আমোদ-প্রমোদ।

শিশির—সেদিন অনেক বাইরের লোক ছিল?

সরল—নাঃ! সেদিন আমার জন্মদিন ছিল। আমরা নিউ মার্কেটে গেলাম বাজার করে আনতে। ঠিক পেয়ে গেলাম। মাশরূম আর কি! মনে পড়ল সুমিতা দারুণ ভালোবাসে। নিয়ে যেতে বলেছে আমাকে। তাই তাড়াতাড়ি সবটাই কিনে নিয়ে গেলাম।

শিশির—[হঠাৎ প্রশ্ন করেছিল] কতটা?

সরল—[আশ্চর্য হয়ে] দু পাউণ্ড। স্রেফ পেঁয়াজ রশুন লংকার গুঁড়ো আর ভিনিগার দিয়ে কারি। সেদিন সুমিতা নিভা আর রানী পিসিমা আগাগোড়া কিচেনে ছিলেন।

শিশির—আপনি কি টেস্ট্ করে নিয়েছিলেন?

সরল—[চকিত তাকিয়ে, হেসে] ওই একটা রুপোর কয়েন নিয়ে আলাদা একটু মাশরূম্ ভেজে টেসট্ করে নেওয়া ত?

শিশির—হ্যাঁ।

সরল—আপনি কি 'মাশরূম' রান্না করতে জানেন?

শিশির—হ্যাঁ। দাদা যখন দার্জিলিং-এ ছিলেন, বৌদি তখন প্রায়ই রান্না করে খাওয়াতেন। রান্নাঘরে বসে বৌদির সঙ্গে গল্প করতাম আর বৌদির রান্না করা দেখতাম কিনা!

সুমিতা—বাব্বা, এখানে দেখছি সবাই-ই খুব 'মাশরূম্' স্পেশালিসট্, যেমন ত্রিদিব দা, তেমনি শিশির বাবু, তেমনি সরল দা।

ত্রিদিব—[ব্যঙ্গের সুরে] মাপ্ করো সুমিতা। রান্না বান্না আমার ঠিক আসে না।

সুমিতা—[যেন ত্রিদিবকে খানিকটা শুনিয়ে] জানলে ভালই হ'ত। খারাপ হ'ত না। আঃ আমার মনে আছে সরল দা যখন রান্না করে লাল কাঁচের বড় পাত্রে ভরে রাখলেন মাশরূম, তখনই

আমার জিভে জল এসে গিয়েছিল একেবারে।

ত্রিদিব—ওঃ, একেবারে জিভে জল এসে গিয়েছিল। তা আর আসবে না! নিয়তি টানছিল যে।

সরল—কিন্তু সেদিন সুমি, ত্রিদিবের উপদেশটা শুনলেই হ'ত। যা একটা কাণ্ড হ'ল তারপর।

সুমিতা—আহা, সরল দা যে কি বলো!

সবল—ত্রিদিব লেবরেটরি থেকে ফিরে জুতো খোলা নেই জামা খোলা নেই সোজা চলল নীচে। কিচেনে। মাশরূম রান্না হয়েছে বলে ওর সে কি রাগ। নেমেই ফ্রিজ খুলে দেখল মাশরূমটা। তারপর ওপরে এসে সুমিতাকে অর্ডার দিল সুমিতা যেন মাশরূমের কারিটা না খায়।

সুমিতা—আর তাতে আমার আরো জেদ চেপে গেল।

সবল—সুমিতা সেদিন একাই সবটা খেয়ে নিয়েছিল। আমরা ত খুব অল্পই খেয়েছিলাম। বাকি যে আর একটা পাত্র ভরতি 'কারি' ছিল তা বাড়ির লোকজনেরা খেয়েছিল।

ত্রিদিব—[উত্তেজিত কণ্ঠে] থামলে কেন? তারপর কি হ'ল সেটা বলো!

সবল—[ম্লান মুখে] সুমিতার একেবারে যায় যায় অবস্থা। আমাদেরও শরীর বেশ ভার ভার হয়েছিল।

ত্রিদিব—ভার ভার আবার কি, পুরো আর্সেনিক পয়জনিং এর লক্ষণ! নার্সিংহোমের ডক্টর বিশ্বাস বললেন না?

সুমিতা—[চোখ নাচিয়ে] হ্যাঁ, বলেছিলেন হতেও পারে। তখন অবশ্য তোমার চোখের সামনে সব সময় আর্সেনিকই ঘুরছে। তুমি তখন ডক্টর সাহার লেবরেটরিতে আর্সেনিক আর লোহা নিয়ে কি সব পরীক্ষা-টরীক্ষা করছিলে। তাই সব সময়েই তোমার ঐ সব কথাই মনে হত।

ত্রিদিব—[সুমিতার কথার উত্তর না দিয়ে] ঠিক আছে যদি কখনো দেখা হয়ে যায়, তুমি ডক্টর বিশ্বাসকে জিজ্ঞেস করো শিশির

শিশির তার মনের টেপ্ রেকর্ডারটা এখানেই বন্ধ করল। তারপর কবি-তার খাতাটা টেনে নিয়ে লিখল,

সরল মিত্র। দীর্ঘাকৃতি। সুগঠিত পুরুষালী চেহাবা। বয়স ত্রিশ। একটু রোমশ। মুখটি টানা ছাঁদের। ঘন ভ্রূ। কপালে প্রতিজ্ঞার চিহ্ন। চোয়াল সুদৃঢ়। চিবুকের মাঝখানে একটি ভাঁজ আছে। একটু কম কথা বলে। চমৎকার সেনস্ অফ্ হিউমার। কাজ কর্মও ভালো বোঝে। চালচলন খাঁটি হিন্দুঘরের ছেলের মত। চটি খুলে ঘরে ঢোকে। এঁটো কাঁটার বিচার মানে। বোধ হয় রানী পিসিমা ওকে জরিপাড় ধুতি পাঞ্জাবি কিনে দেন না। অথবা ও নিজেই পরতে চায় না। ওর পরণে টাইট ধরনের হ্যাণ্ডলুমের হাফশার্ট আর দামী খাকি কাপড়ের প্যাণ্ট, চমৎকার মানিয়েছিল কিন্তু। শিশির লেখা থামাল।

আবার চালিয়ে দিল মনের টেপ্ রেকর্ডার।

শিশিরকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসেছিল ত্রিদিব। তারপর পাশা-পাশি হেঁটে আরো খানিকটা গেল। শিশিরই ওকে গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতে বারণ করেছিল। রাস্তায় নেমে হঠাৎ শিশির প্রশ্ন করেছিল,

—আচ্ছা ত্রিদিব যেদিন এই মাশরূম্ রান্নার ঘটনাটা ঘটে সে দিন তুমি অত চটে গিয়েছিলে কেন? সুমিতা দেবীকে নিষেধই বা করেছিলে কেন 'কারিটা' খেতে?

ত্রিদিব বলেছিল,

—ওদের সামনে তোমায় বলতে পারি নি শিশির। আমি সেদিন নিজের চোখে নীচে কিচেনের তরকারী কাটার পাথরের টেবিলে একটা কলঙ্ক ধরা কয়েন দেখেছিলাম। একটা রূপোর সিকি। সুমিতাকে যখন বলতে গেলাম ওই মাশরূমের কারি ও যেন না খায়, তখন নিশ্চয়ই সরল সেটা

সরিয়ে নিয়েছিল। 'কয়েন'টা যে কেন তখন তুলে নিই নি। মনে মনে পরে খুবই আপশোস হয়েছিল। ডক্টর সাহার লেবরেটরিতে ওটাকে নিয়ে অ্যানালাইজ করতে পারতাম।

শিশির প্রশ্ন করেছিল,

—কয়েনটা আর কেউ দেখে নি ?

—না।

শিশির আবার প্রশ্ন করেছিল,

—সুমিতা দেবীর পয়জনিং সম্বন্ধে সরল বাবুর কি ধারণা ?

—সরলের ধারণা আরো আজব। তার ধারণা 'মাশরূমে' নয়। টেবিলের আর কোনো খাবারে আর্সেনিক মেশানো ছিল। মাশরূমে নয়। কারণ লোকজনেরাও মাশরূম খেয়েছে তাহলে তাদের কিছু হল না কেন ?

শিশিরের মনে পড়েছিল কাল রাত্রে সে খুব অদ্ভুত একটা কাজ করে বসেছিল। নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটার সময় পাড়ার ডাক্তারখানা থেকে হঠাৎ সুমিতাকে একটা ফোন করে বসে-ছিল।

—নমস্কার! আমি শিশির কথা বলছি! আপনি সুমিতাদেবী ?

—হ্যাঁ। কিন্তু এত রাত্রে ? ত্রিদিবদাকে ডেকে দেব ?

—না।

শিশির নিজের লাজুক স্বভাবের মধ্যে প্রায় গুটিয়ে যাচ্ছিল। তারপর নিজেকে ইচ্ছাশক্তি দিয়ে ঝাঁকি দিয়েই প্রায় কণ্ঠে একটা আলগা স্মার্ট-নেস্ ফুটিয়ে তুলল।

—আপনার একটু অদ্ভুত লাগছে, কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি, খুব অবা-স্তব শোনাবে এমন একটা কারণে একেবারে আপনাকেই ফোন করছি।

—বলুন।

—আসলে আমি হঠাৎ আপনাদের বাড়ি থেকে ফিরে এসে একটা ডিটেকটিভ গল্পের মুসাবিদা করতে বসেছিলাম। ধরুন আপনাকে পয়জন

করার ব্যাপারটা সত্যি। ধরুন আমার গল্পের প্লটের কারণে। ধরুন মাশ-রুমে পয়জন্ ছিল না। অন্য কিছুতে ছিল। ধরুন···

—না ধরুন টরুন বলার কিছুই নেই শিশিরবাবু। আমি ঠিক জানি মাশরুমে পয়জন্ ছিল না। আমি নিজে ব্যাগ্ থেকে রূপোর সিকি বের করে দিয়েছিলাম। সরলদা আমার সামনে একটুখানি মাশরুম কেটে নিয়ে ভেজে টেস্ট করে নিলেন। আমি আবাব সিকিটা তুলে রাখলাম ব্যাগে। তখনো সমান ঝক্‌ঝকে।

—ধন্যবাদ। এইটুকু জানবার জন্যেই ফোন করেছিলাম--এবার ছাড়ি। ছাড়াব আগে সুমিতা তাব স্বভাবসিদ্ধ কৌতুককণ্ঠে বলেছিল—গল্পটা লেখা হয়ে গেলে নিশ্চয়ই পড়াবেন।

শিশির সমস্ত ঘটনাগুলো বসে বসে ভাবছিল। শীতের সকালে তার কবিতার খাতায় লিখল – সুমিতা রায়। বয়স চব্বিশ পঁচিশ। মাথায় বাদামী কালো চুলের রাশি। তেলের বালাই নেই। বাদামী কালো চোখ আর ভ্রূ। অনেক রকম দুঃখ পেয়েছে, তবু চোখভরা হাসি। বড়লোকের একমাত্র মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও আশ্চর্য বুদ্ধিমতী। তবে ওর একটি ব্যাপার আমার ভালো লাগল না। একই সঙ্গে সুমিতা সরল আর ত্রিদিব দু-জনকেই যেন হাতে রাখতে চায়। কাউকে বুঝতে দিতে চায় না ওর মনের কাঁটা কারদিকে ঝুঁকেছে।

রানী পিসিমা। শান্ত শ্রীময়ী মহিলা। রূপোলী কালো চুল। প্রতিমার মত মুখশ্রী। বয়স বোধহয় পঞ্চাশ পঞ্চান্ন। ফিতে পাড় শাড়ি পরেন। বোধহয় বিধবা। সন্তান সন্ততি নেই। উনিও কি এ-বাড়ির আশ্রিতা? সুমিতাকে খুবই ভালোবাসেন। তারপর ত্রিদিবকে। সরলের বিষয়ে কেমন যেন একটু আড়ষ্ট ভাব। সুমিতাদের কে হন? নিজের পিসিমা?

নিভা বক্সী। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে আনা হয়েছে। সুমিতার পেশা-দার সঙ্গিনী। কাজে কর্মে চোস্ত। বয়স চব্বিশ পঁচিশ। চমৎকার ফিগার। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। আর খানিকটা যাকে বলে রসবতী।

শিশির এই পর্যন্ত লিখে নিজের মনে মনে হাসল একটু। আমি কি সত্যিই ডিটেকটিভ বই লিখতে পারব কোনোদিন? না কি খামোখাই কবিতার খাতাটা নষ্ট করলাম!

শিশির নিঃশব্দে হাসল একটু।

ত্রিদিব শিশিরের প্রতি একটু অসন্তুষ্টই হয়েছে।

শিশির অতরাত্রে সুমিতাকে ফোন করতে গেল কেন? মাত্র একদিনের আলাপে।

ত্রিদিব পরমুহূর্তে ভাবল হয়ত শিশির ঠিকই করেছে। শিশির যা কিছু করেছে তা'ত ত্রিদিবের কথা ভেবেই। নিজের ঘরের ভেতর অস্থির ভাবে পায়চারী করতে করতে ত্রিদিব খালি ওই এক কথাই ভাবছিল।

একবার আদ্যোপান্ত সব মনে করে নিজের ওপরই ঘোরতর ক্রোধ হল ত্রিদিবের। তারপর আবার শিশিরের ওপর সন্দেহ এল। আজকাল সত্যি ত্রিদিব নিজেই বুঝতে পারে সে যেন আর আগের মত নেই। সব কিছুতেই তার খালি অবিশ্বাস আর সন্দেহ। কেবল মনে হয় সুমিতা যেন তার জীবনে একটা হঠাৎ হাতে আসা স্বর্গ। সুমিতাকে সে যেন হঠাৎ হারিয়ে ফেলবে। হতেও পারে। সবই হতে পারে। সুমিতা বড় মানুষের মেয়ে। সুন্দরী। বুদ্ধিমতী। আর শিশির কবি। অধ্যাপক। চেহারার মধ্যে চমৎকার একটি বাঙালীসুলভ আলগা শ্রী আছে। যদি শিশিরকেই সুমিতার হঠাৎ মনে ধরে যায়।

ত্রিদিবের মনে হল এ বাড়ির লোকেরা শিশিরের প্রতি অত্যধিক আগ্রহ দেখাচ্ছে। কিন্তু কেন?

সরল বলছিল ইতিমধ্যে তারও নাকি শিশিরের সঙ্গে দেখা হয়েছে। পথে দেখা। তারপর সেখান থেকে সরল শিশিরের বাড়ি পর্যন্ত গিয়েছিল।

ত্রিদিব অবশ্য ঐ হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়া টাওয়ায় আদৌ বিশ্বাস করে না। বিনা প্ল্যানে সরল যে কোন কাজ করে না তা ত্রিদিবের বিলক্ষণ

জানা আছে।

কিন্তু সরল কেন অত বন্ধুত্ব করছে ত্রিদিবের সঙ্গে। শিশির ত্রিদিবের একমাত্র বন্ধু। শিশির ছাড়া আর ত্রিদিবের কোনো বন্ধু নেই। সেই শিশিরকে সরল কেন অধিকার করে বসবে?

আজও শিশির এসেছে। সরল নাকি তাকে নিজের গাড়িতে করে তুলে নিয়ে এসেছে। নীচে জমিয়ে বসেছে। কথাবার্তার ধারা যেভাবে বইতে শুরু করেছে তাতে দারুণ বিরক্ত হয়ে ত্রিদিব ওপরে নিজের ঘরে চলে এসেছে। রাগে তার সারা শরীর যেন থর থর করে কাঁপছিল। শিশির অবশ্য বারবার তাকে থাকতে বলছিল।

ত্রিদিব সেদিকে কান দেয় নি। তার খালি মনে হচ্ছিল এই পরিবারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার পর শিশির আর তার প্রতি যথেষ্ট মন দিচ্ছে না। সিঁড়ির ওপর থেকে নীচেটা পরিষ্কার দেখা যায়। মার্বেল পাথরের দুটো চওড়া সিঁড়ি নেমে এসে মাঝপথে মিশেছে একটি চওড়া সিঁড়ির সঙ্গে। নিচের বিশাল হলঘরটা বাড়ির প্রায় সমস্ত একতলাটা জুড়ে। ওপর থেকে সমস্ত ব্যাপারটা থিয়েটারের সাজানো সেটের মত লাগছিল। তিন সেট্ সোফা সেটি সাজানো। তিন পিস কার্পেট বিছানো সত্ত্বেও কতখানি জায়গা পড়ে আছে। বেয়ারা চায়ের ট্রে নিয়ে এলে সুমিতা নিজে চায়ের পেয়ালা এনে হাতে তুলে দিচ্ছিল শিশিরের। চোখে চোখে কথা, হাসি। ওপর থেকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন নাটক দেখছে। যেন কত দিনের পরিচয়। রানী পিসিমার সঙ্গে পাশাপাশি সোফায় বসে ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলছিল।

শিশির আবার এত কথা বলতে শিখল কোথা থেকে।

সারা সন্ধ্যেটা ত্রিদিবের খুব খারাপ কেটেছে। একা একা চুপ চাপ নিজে ঘরে শুয়েছিল ত্রিদিব। চিন্তায় মাথা ভারি। তার মনের ভিতর যেন কোন নিয়তি কথা বলে উঠছে। খুব দ্রুত যেন একটা কিছু ঘটে যাবে। ত্রিদিব ঠিক বুঝতে পারছে। অথচ এই সময়েই কি যে একটা নতুন জট পড়ল।

কোথায় শিশির তাকে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবে তা নয়, সে সরলের সঙ্গে ভিড়ে গেল।

মাঝে শিশির আসার খবর পেয়ে সে নীচে নেমেছিল। কিন্তু পরিবেশের কৃত্রিমতা সহ্য করতে না পেরে ওপরে উঠে এসেছিল। ত্রিদিব আস্তে আস্তে নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়ল। ত্রিদিব তার বন্ধ চোখের সামনে যেন পাত্র-পাত্রীদের চলা-ফেরা দেখছিল।

সরলই প্রথম শুরু করেছিল আজ।

সরল—বাব্বা, সুমি, মনে পড়ে তোমার সেই চারতলার আগুন লাগার কথা!

নিভা—[অস্ফুট কণ্ঠে] উঃ

সুমিতা—মনে পড়ে না আবার, জানেন শিশিরবাবু,

ত্রিদিব—[বিব্রত কণ্ঠে] আঃ সুমি, তোমার যে কি অব্‌সেসন হয়েছে, কেবল ঐ একই কথা, দুর্ঘটনার কথা। ডাক্তারবাবু তোমায় কি বলেছেন মনে আছে?

সুমিতা—[আশ্চর্য হবার ভঙ্গি করে] দুর্ঘটনা! বাঃ দুর্ঘটনা আবার কোথায়? তুমি ত বলো দুর্ঘটনা নয়। ওটা নাকি ডেলিবারেট। মানে ওই আগুন লাগানোর ব্যাপারটা।

তবে আজ আবার নতুন রকম বলছ কেন?

শিশির—[ত্রিদিবকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে] বলুন না সুমিতা দেবী। শোনা যাক। ত্রিদিবের কথা নাই বা শুনলেন।

সুমিতা—[খুব জমিয়ে গল্প করার ভঙ্গিতে] বাবা মারা যাবার বছর খানেক আগে আমার থাকার জন্য চারতলার ছাদের ওপর দারুন একটি ফ্ল্যাট্ তৈরী করাতে আরম্ভ করেন। ওঃ অবাক হচ্ছেন? না, না, এখন চারতলাটা আবার যে কে সেই। ফাঁকা ছাদ। সব ভেঙে চুরে সমান করে দেওয়া হয়েছে। ওপরটা বিশ্রিভাবে পুড়ে গিয়েছিল।

রানী পিসিমা—তোমার বাবারও যেমন কাণ্ড। মেয়ে মেয়ে করে মানুষ আবার এত পাগলও হয়। কাঁচ আর কাঠ দিয়ে প্রায় জতুগৃহ তৈরী করে দিয়েছিলেন একটা। আমি বলেছিলাম তেতলা থেকে ছাদে যাওয়াব বাড়ির ভিতরের যে সিঁড়িটা আছে অন্ততঃ সেটার মুখটা খোলা থাক। তা, তিনি বললেন, না তাও থাকবে না। সব সেপারেট করে দেব। তাঁর খুবই ইচ্ছে-ছিল বাকি খোলা ছাদটায় একটা বাগান করে দেবেন সুমির জন্য।

সুমিতা—না, না, জতুগৃহ না রানী পিসিমা। বাবা তখন সদ্য জাপান থেকে ফিরেছেন ত, ওদের ওই চমৎকার বাড়িগুলো বাবার ভীষণ মনে ভালো লেগেছিল। কেবলই বলতেন বাড়ির এই পুরোনো কেতার জানলা দরজা থাম তাঁর গলা চেপে ধরে।

সরল— না পাঁচতলাটা সম্পূর্ণ আলাদা করে দেওয়ার আরো একটা কারণ ছিল, সুমিকে কমপ্লিট্ একটা প্রাইভেসি দেওয়া আর সম্পূর্ণ আলাদা একটা পরিবেশ, মানে এ্যাট্‌মসফিয়ার দেওয়া। ওই জন্যেই তিনতলার ছাদে যাবার সিঁড়িটা বন্ধ করে আলাদা একটা সিঁড়ি টেনে দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন।

নিভা—হ্যাঁ, কাকাবাবু বলতেন, বিয়ের পর সুমি যখন চারতলায় থাকতে যাবে তখন আমি তিনতলা থেকে চারতলায় যাবো হাওয়া বদলাতে। বোগেন ভোলিয়াব চারপাঁচ রঙা ঝাড়টা কাকা-বাবু সিঁড়ি দিয়ে চারতলা পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবার জন্যই প্ল্যান করে পুঁতেছিলেন।

সুমিতা—আর জানেন শিশিরবাবু, আগুন লাগতে সবচেয়ে প্রথমে খসে পড়ল ওই সিঁড়িটাই। এমনি কপাল আমার।

রানী পিসিমা—[গম্ভীর কণ্ঠে] কিন্তু ত্রিদিবকে তোমরা যতই উড়িয়ে দাও, শেষ পর্যন্ত ত ওর কথাই ফলল।

ত্রিদিব—[খুশি খুশি গলায়] বলুন রানী পিসিমা, আপনিই বলুন। আমি কত আগেই সুমিকে বলেছিলাম চারতলাটা ওর পক্ষে কিছুতেই নিরাপদ নয়। আমি ওকে পাকা সিঁড়ি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেছিলাম। আমার খালি মনে হ'ত চারতলায় যদি আগুন লাগে তাহলে সুমির টেন্‌ডেন্‌সিই হবে ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ার। কিম্বা সিঁড়ি দিয়েও ত কেউ ঠেলে দিতে পারে তাকে।

সবল—ঘটনাটা কিন্তু প্রায় তাই-ই হ'ল। একেবারে অক্ষরে অক্ষরে। [সুমিতাকে লক্ষ্য করে] সুমি, তুমিই বলো না! আমি ত ঠিক প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম না। আগুন যখন লাগল রাত্রি তখন [সবল জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ঘোরালো নিভা, ত্রিদিব, সুমিতা আর রানী পিসিমার মুখগুলির উপর দিয়ে।]

নিভা—[সবলের প্রশ্নটা লুফে নিয়ে] রাত্রি সাড়ে বারোটায়।

রানী পিসিমা—আর তুমি বোধ হয় খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলে রাত্রি আটটায়। তাই না? তুমি সেবার কোথায় যেন গিয়েছিলে সবল?

সরল—দুর্গাপুর।

সুমিতা—[সকৌতুকে] তারপর শুনুন শিশিরবাবু, আমি ত বায়না ধরলাম যে, যে দিন চারতলার ফ্ল্যাটটা কমপ্লিট্ হবে, সেই দিনই আমাকে চারতলায় শিফট করতে দিতে হবে। [গলা নামিয়ে] আসলে নানান কারণে আমি বায় বাড়ির এই সেকেলে জংলা আর্কিটেকচার আর গলাচাপা আবহাওয়াটা সহ্য করতে পারছিলাম না। নানান কারণ না বলে একটা বিশেষ বড়ো কারণ বললেও ক্ষতি নেই। আমার ঘরটা আবার ঠিক বাবার ঘরের পাশেই ছিল। বাবা আর আমি তিনতলার ড্রইংরুম আর লাউঞ্জ ব্যবহার করতাম। কারণ রাতে শোয়া

ছাড়া বাবা ত প্রায় বাড়িই থাকতেন না। ড্রইংরুম আর লাউঞ্জ নামে দুজনের কমন হলেও, আসলে আমার একলারই ছিল। তবু বাবা নেই একথা মনে পড়লেই সারা তিনতলাটা আমার কাছে জনহীন মরুভূমির মত মনে হ'ত। তাই চারতলায় যাবার জন্য অত ছট্‌ফট্‌ করেছিলাম। ত্রিদিবদা, সরলদা আর রানী পিসিমা কত বারণ করেছিলেন। কারো কথা শুনতে চাই নি।

নিভা—[চঞ্চল কণ্ঠে] আমি কিন্তু বারণ করি নি। কি যে সুন্দর হয়েছিল চারতলটা। তিনতলা দোতলা একতলার সঙ্গে কোনো মিলই নেই। আগাগোড়া নানান রঙের ফ্লিন্ট্‌ গ্লাশ আর পাতলা কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরী। রোদের সময় ভিতর থেকে ভারি ভেলভেটের সবুজ পর্দা টেনে দেবার ব্যবস্থা। ভিতরের আসবাবপত্রও সব বিদেশী বইএর ডিজাইন দেখে দেখে করানো। সোফা, কৌচ ইত্যাদি ইত্যাদি একদম নয়। লে-ডিভান, পুফে, মাটিতে পাতা নরম ফোমের গদি।

সুমিতার ঘরটা ত সুন্দর করে সাজানো ছিলই, কিন্তু আমার নিজের ঘরটা আরো 'কোজি' আরও সুন্দর ছিল। কাকাবাবুকে আমি বলেও ছিলাম সে কথা।···তবে আমার ঘরটা বাঁচে নি।

ত্রিদিব—কিন্তু তুমি ত বেঁচে গিয়েছিলে নিভা!

নিভা—তা সত্যি, কিন্তু সে দৈবাৎ [বলে সে সুমিতার দিকে চেয়ে চাপা অর্থপূর্ণ হাসি হাসল]

সুমিতা—[চাপা হাসি ফিরিয়ে দিয়ে] আমি কিন্তু তোমার ঐ দৈবাতের হাটে হাঁড়ি ভাঙব আজ। আমি সে কথা অ্যাদ্দিন চেপে গিয়েছিলাম। কিছুতেই চাপব না আজ। সব আউট করে দেব।

নিভা— [ছদ্মকোপে] লক্ষীটি সুমিতা, প্লিজ্।

রানী পিসিমা—আজকাল তোরা সব যে কি হচ্ছিস সুমি। সব তাতেই হাসি। মানুষের বাঁচা মরা নিয়েও তোরা ঠাট্টা করতে ছাড়িস না বাপু!

[ত্রিদিব সরল রানী পিসিমা আর শিশির উসখুস করে উঠল সুমিতার গোপন কথা শুনবার জন্য]

সুমিতা—[নিভার দিকে তাকিয়ে নিয়ে] আসলে ও তখন ডায়েটিং করছিল! রাত্রে খাবার টেবিলে কিচ্ছু খাবে না। সব সরিয়ে সরিয়ে দিত। তারপর রাতে খিদেয় ছট্‌ফট্ করত।

[নিভার লজ্জিত অবনত মুখের দিকে তাকিয়ে সবলের বোধহয় খুব মায়া হল]

সবল—সুমি দিস্ ইস্ ব্যাড্! বেচারিকে এভাবে লজ্জা দেওয়ার কোনো মানেই হয় না।

সুমিতা—খুব মানে হয়, হবে না কেন? ওইটেই ওয়ান্ অফ দি হোল থিং। ডায়েটিং করতে গিয়ে একটা মেয়ে আগুনে পোড়ার হাত থেকে বেঁচে গেল।

আমরা দুজনে সেদিন রাত্রি সাড়ে এগারটা পর্যন্ত রেডিওগ্রামে রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনছিলাম। তোমার মনে আছে নিভা? শেষ গানটা যেন কি ছিল? –চিন্ময় চ্যাটার্জির—বলি ও আমার গোলাপ বালা···

তখনই মনে হচ্ছিল কোথায় যেন কি একটা জিনিষ পুড়ছে। সেই রকম রোমান্টিক্ মুহূর্তে নিভা বলল সুমিতা রাতের খাবার টেবিলে কিচ্ছু খেলাম না, এখন আমার খুব খিদে পাচ্ছে। তিনতলার ফ্রিজে বোধহয় দুধ আর সন্দেশ রাখা আছে, বরং একটু খেয়ে আসি।

[সুমিতার গোপনকথা শুনে সবাই আবার হোঃ হোঃ করে

হেসে উঠল]

নিভা—[সুমিতার কথার পৃষ্ঠে দ্রুত বলল] আর আমি যখন খেয়ে আবার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যাচ্ছি, তখন দেখলাম সুমিতা জ্বলন্ত দরজার মুখে নিরুপায়ের মত দাঁড়িয়ে আছে, আর আমাকে সাবধান করছে—সরে যাও, সরে যাও নিভা, সিঁড়িটা পড়ে যাচ্ছে।

বানা পিসিমা—আমি বোধহয় তখন একটু ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। চেঁচামেচি শুনে আগুন আর ধোঁয়া জানালা দিয়ে দেখে আমি ত এত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম যে বুকের ব্যথায় একেবারে অস্থির। সব শক্তি জড়ো করে, যখন বেরিয়ে এলাম, তা মিনিট পাঁচসাত পরে তখন দেখি তিনতলার বাথরুমের মাথায় উঠে ত্রিদিব গঙ্গাজলের ট্যাঙ্ক থেকে টিনে করে জল ঢালছে। ধোঁয়া আর অন্ধকারে কোনো কিছুর ঠাহর পাচ্ছিলাম না।

ত্রিদিব—কিন্তু একটা কথা বলি। আমি আগেও বলেছি নতুন দরজা জানালার রঙের উগ্র গন্ধ সত্ত্বেও পেট্রলের গন্ধ চাপা পড়ে নি। আমার দৃঢ় ধারণা কেউ পেট্রল ঢেলে দিয়েছিল।

নিভা—দিয়ে ত ছিলই। তোমার মনে নেই, ত্রিদিবদা বললেন না ওঁর গাড়ির জন্য যে দু'গ্যালন পেট্রল নেওয়া ছিল তা সব সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। বেড়াতে বেরিয়ে দেখেছিলেন ট্যাঙ্কে পেট্রল নেই।

সরল—[চিন্তান্বিত কণ্ঠে] নিশ্চই কেউ ত্রিদিবের ট্যাঙ্ক থেকে পেট্রল সরিয়ে নিয়েছিল। তার পর টিনে ভরে রেখে দিয়েছিল কোথাও। সুযোগ বুঝে ছড়িয়ে দিয়েছিল সারা ঘরে। কিন্তু আমার প্রশ্ন কেন এত কাণ্ড! কি বলো ত্রিদিব। এত কাণ্ড করার কি কিছু দরকার ছিল ?

[ত্রিদিব সরলের কথার কোনো উত্তর না দিয়ে ওপরে উঠে আসছিল সে যখন সিঁড়ির প্রান্তে শিশির তখনই একটা নাছোড়বান্দা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিল তার দিকে]

শিশির—ত্রিদিব, শোনো। তুমি সেদিন রাত্রে গাড়ি নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলে ?

ত্রিদিব –[ফিরে দাঁড়িয়ে, বিরক্ত কণ্ঠে] হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।

শিশির—তুমি বুঝি প্রায়ই যেতে।

ত্রিদিব—ক্বচিৎ কখনো।

শিশির—কোথায় গিয়েছিলে সেদিন।

ত্রিদিব—চৌরঙ্গিতে !

শিশির—অত রাতে ?

ত্রিদিব—হ্যাঁ।

শিশির—তোমার ট্যাঙ্কে ত পেট্রল ছিল না।

ত্রিদিব—সেণ্ট্রাল এভিনিউর একটা স্টেশন থেকে পেট্রল কিনে নিয়েছিলাম।

শিশির—তা, হঠাৎ ফিরে এলে কেন ?

ত্রিদিব—[সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে] আমার মন বলল, সুমিতার কিছু একটা বিপদ ঘটবেই।

শিশির—বাড়ি ফিরে কি করলে তুমি ?

ত্রিদিব—[সিঁড়ির প্রথম বাঁকের মাথায় থেমে] বাড়ির পিছন দিকের দরজায় গাড়িটা রাখলাম আমি। যখন নামলাম তখন বাগানটা আগুনের আভায় আলোময় হয়ে উঠেছে। সিঁড়িটার রেলিংগুলো, কাঠের রেলিং,···ধরে গেছে আর দাউ দাউ জ্বলছে। চারতলায় সুমিতার ফ্ল্যাটে মাটি থেকে সিলিং পর্যন্ত যে সব ভেলভেটের পর্দা লাগানো ছিল সেগুলো ধূ ধূ করে আগুনে জ্বলে যাচ্ছে আর হাওয়া উড়ছে, আর আগুন ছড়াচ্ছে।

আশেপাশের বাড়ির লোকও তখন উঠে পড়েছে। চাকর-বাকর কর্মচারীরা সব অসহায়ের মত ছোটাছুটি করছিল। ওদের কিছুই করবার ছিল না। দুহাত বাঁধা। কারণ তিন-তলায় জল থাকলেও সে জল চারতলায় নিয়ে যাবার কোনো উপায় নেই। ভয়ে আতঙ্কে কারো খেয়াল অব্দি হয় নি যে ফায়ার ব্রিগেডে ফোন করে দেয়। আমি বলতে তখন সরকার মশাই ফোন করে দিলেন। অবশ্য তার আগে পাড়ার লোকই ফোন করে দিয়েছিল। কারণ খুব তাড়াতাড়ি দমকল এসে গিয়েছিল।

[ত্রিদিব এবার সিঁড়ির দ্বিতীয় ধাপগুলো দিয়ে উঠতে লাগল। সে আবছা শুনতে পেল রানী পিসিমা বলছেন]

রানী পিসিমা—তবে সত্যি, ধন্যি বলি আমাদের ত্রিদিবকে। নিজের জীবন তুচ্ছ করে ও তিনতলার বাথরুমের ছাদে উঠে, ট্যাঙ্ক থেকে জল তুলে ছিটোচ্ছিল।

সুমিতা—সাহস না আরো কিছু। ত্রিদিবদা যখন হাত বাড়িয়ে আমাকে নামিয়ে আনতে যাচ্ছিল চারতলার আলসে থেকে তখন আগুনের লাল ঝলকেও দেখেছিলাম ওর মুখ কাগজের মত শাদা। ও খুব ভয় পেয়েছিল।

ত্রিদিব—[ওপরের বারান্দা থেকে] ভয় পাবো না, বাঃ আমি ত আর সার্কাসের খেলোয়াড় নই। যে দিব্যি ট্রাপিজ প্লেয়ারের ধাঁচে তোমাকে লুফে নেব। যতই নীচের দিকে তাকাই ততই মাথা ঘুরে যায়। তবে দমকলের লোকেরা সময় মত না এসে পড়লে নামিয়েই নিতাম ঠিক তোমায়।

[তারপর ত্রিদিব আর দাঁড়ায় নি। নিজের ঘরে চলে এসেছিল]

নাটক শেষ হল।

নীচে এখনও হাসির আওয়াজ। চায়ের পেয়ালার টুং টাং। ওপরে ত্রিদিব

একা অন্ধকার ঘরে শুয়ে আছে। আর জানালার পাশেই শিউলি গাছের ফুলে ফুলে শাদা স্নুগন্ধি মাথাটা। হিম হাওয়ার ঝাঁকুনিতে আকুল করা গন্ধ আসছে। নিজেকে ভীষণ একা আর পরিত্যক্ত মনে হল ত্রিদিবের। তার সমস্ত মনটা ক্রমশঃ যেন বিষে জর্জরিত হয়ে যাচ্ছিল। যেমন বিষ-পোকার কামড়ে টন্‌টনে ব্যথা হয়ে ফোড়া ওঠে দুষিত রক্তের জ্বরে পাক ধরে পুঁজ জমে সমস্ত বিষাক্ত স্থানটাব মাংসখণ্ডগুলোর তাপমাত্রা বেড়ে যায়। ত্রিদিবেরও সেই অবস্থা। সে পরিষ্কার বুঝতে পারছে একটা কিছু ঘটবে। সমুদ্রের তীরবর্তী ঢেউ দেখে যেমন অভিজ্ঞ দ্রষ্টা বুঝতে পারে, এবার ফুলে উঠছে ফাট্‌বার জন্য। যেমন ঝানু জেলেব মুখ দেখে সমঝানো যায় যে এবারে সে জাল টেনে তুলতে পারে।

অথচ শিশিবের সঙ্গে এবিষয়ে আলাদা করে সে কোনো রকম আলোচনা করারই স্নুযোগ পাচ্ছে না। শিশির কিছুতেই ত্রিদিবের আশঙ্কার কথা কানে তুলছে না। ঠিক রানী পিসিমার মতই উড়িয়ে দিচ্ছে। তার অন্যতম কারণ সরলের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত পরিচয়। একজন সভ্য, ভদ্র পোষাক-আসাক পবা, জার্মানী ফেরং টেক্‌নিশিয়ানকে দেখে. তার মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনে কে আর কবে তাকে ষড়যন্ত্রকারী খুনী ভাবে?

কিন্তু ত্রিদিব তার অন্তরে অন্তরে জানে যে সরল আব অপেক্ষা কববে না। কিছুতেই না। এবার সে খুব তাড়াতাড়িই তার জাল গুটোবে। কালকেই একটা রেস্তোঁরায় বসে ত্রিদিব নিজের আশঙ্কার পক্ষে যে যুক্তিগুলো সেগুলোকে শিশিরের সামনে তাসের মত মেলে ধরেছিল। শিশির কর্ণপাতও করে নি। বরং ফুলদানীর বাসী সূর্যমুখী ফুলগুলো নাড়তে নাড়তে বলেছিল,

—আচ্ছা ত্রিদিব, তুমিই বা এতো আগে ভাগে সব জানতে পারো কি করে? আর তুমি যা জানতে পারো তাই-ই ঠিক পরে ঘটে যায় কি করে? ত্রিদিব একটু চিন্তা করেছিল। তার বলার ইচ্ছে ছিল কারণ, যে প্রেমিক সে নিজের মানুষটির মন্দ সব দুর্ভাগ্যের কথা বোধহয়

আগেই বুঝতে পারে। কিন্তু সে তা বলে নি। সে পাল্টা প্রশ্ন করেছিল —তবে, তুমি কি সন্দেহ করছ আমিও এই ষড়যন্ত্রের একজন বা একমাত্র যন্ত্রী।

শিশিব বলেছিল,

—না, তা নয়। কিন্তু আমাদের ত প্রশ্ন কবে করে সব দিকগুলো নিজেদেবই ঠিক বাখতে হবে। ধরো সবলই যদি এই প্রশ্ন নিয়ে তোমার সমানে চলে আসত!

ত্রিদিব বলেছিল,

—দেখো আমার এখন মনে হচ্ছে, হয়ত আমি যা আশঙ্কা করি তা বোকাব মত ওব সামনে বলে ফেলি। ও মানে সরল। আর সরল ঠিক সেই প্ল্যানটাই নিয়ে নেয়।

শিশিব বলেছিল,

—হ্যা, তা হতে পারে!

—আব তা ছাড়া!...

কথাটা শেষ করতে গিয়ে ত্রিদিবেব কান গরম হয়ে গিয়েছিল,

—তা ছাড়া, আমি ত আর বিশ্বসুদ্ধ লোকের ভালোমন্দ ভূত ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। অন্ততঃ একজনের ভলোমন্দ বোঝার মত মানসিক ক্ষমতা আমার যে নেই তা তোমায় কে বোঝালে?

শিশিব ত্রিদিবেব দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলেছিল,

—হ্যা, সেটা একটা ভাববার বিষয়ই বটে!

ত্রিদিব উঠে দাঁড়িয়ে বিল চোকাতে চোকাতে বলেছিল,

—শিশিব এই উপলব্ধি নিয়ে তুমি কিন্তু ভাই বৃথাই কবিতা লিখছ!

শিশির আবারও হেসে বলেছিল,

—তা আর বলতে!

—বিছানার আয়তাকার বিস্তারেরমধ্যে ছট্‌ফট্‌ করতে করতে ত্রিদিবের এক সময় এত অবসাদ এলো যে সে নিজের আমূল একাকীত্বের ভার

আর বহন না করতে পেরে উঠে গিয়ে একটা ঘুমের বড়ি নিয়ে নিজের গলায় ফেলে দিয়ে খানিকটা জল খেয়ে নিল।

ক্রমশঃ তার নিজের নানানভাবে গড়ে-ওঠা, আধাগড়া সত্তার সঙ্গে তার পরিবেশের বিরুদ্ধ শক্তিগুলোর সঙ্গে যুঝতে যুঝতে ওষুধের প্রভাবে যখন তার স্নায়ুগুলি মুচ্‌ড়ে মুচ্‌ড়ে হীনবল হয়ে পড়ল ত্রিদিব তখন আস্তে আস্তে ঘুমের মধ্যে ডুবে যেতে লাগল।

হঠাৎ চটাৎ করে ঘরের মধ্যে মুহূর্তে বিদ্যুৎ খেলিয়ে দশ ডালের আধুনিক ঝাড়টা কেউ জ্বেলে দিতেই ত্রিদিব চম্‌কে উঠে বসল বিছানায়। তার চোখদুটি তখনও দিনেরবেলার বেড়ালের চোখের মত কুঁচকে আছে। সে আব্‌ছা দেখলে রানী পিসিমা তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

রানী পিসিমা ওর কাছে সরে এসে ঠাণ্ডা গলায় বললেন,

—তুমি হঠাৎ ওপরে চলে এলে কেন ত্রিদিব? শিশির ত আসলে তোমারই বন্ধু। যাবার সময় শিশিব বলেছিল, রানী পিসিমা আমি বরং ত্রিদিবের সঙ্গে একবার দেখা করে যাই। সুমিতা ওকে তোমার ঘরে নিয়েও এসে-ছিল। আলো নেভানো দেখে ওরা ফিরে গেল। ভেবেছিল তুমি হয়ত ঘুমোচ্ছ।

রানী পিসিমা আস্তে আস্তে ত্রিদিবের মাথার কাছে চওড়া খাটটার ধারে বসলেন। ত্রিদিবের মাথার চুলের ওপর আল্‌তো হাত রেখে বললেন,

—আচ্ছা ত্রিদিব, তোমাকে কতবার বলেছি না নিজের আবেগ, মেজাজ মুড্‌ এসবের ওপর কড়া পাহারাদারী করবে। আমার মুখ-চেয়েও ত তোমার সকলের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে ব্যবহার করা উচিত। সরল সুমিতা আমি কিম্বা নিভার কথা ছেড়ে দাও। আমরা ঘরের লোক। কিন্তু শিশির ত তোমার বন্ধু। সে যদি, কিছু মনে করে বসে।

ত্রিদিব অসুস্থ একটু হাসল।

—রানী পিসিমা আমার ব্যবহার স্বাভাবিক অস্বাভাবিক যাই হোক না কেন? আমার দিকে ত কারো লক্ষ্য নেই। কেউ খাঁড়া উচিয়ে নেই

আমার দিকে। আপনারা আমাকে বাদ দিয়ে এখন সুমিতাকে লক্ষ্যে লক্ষ্যে রাখুন। দরকার হলে পাহারার ব্যবস্থা করুন।

রানী পিসিমা যেন হাসলেন একটু। ত্রিদিব তাঁর মুখ দেখতে পাচ্ছিল না। কিন্তু টের পাচ্ছিল।

আস্তে আস্তে রানী পিসিমার স্নেহমাখা আঙুলগুলি ত্রিদিবের চুলের মধ্যে নেমে এল। শান্ত স্নেহের ছায়ায় ত্রিদিবের চোখের কোণে জল উপচে এল। অনেক সুখ দুঃখের সূক্ষ্ম অনুভূতি অনেক স্মৃতি তার বন্ধ চোখের পাতায় ঝল্‌সে গেল। ত্রিদিব হাল্‌কা গলায় বলল,

—রানী পিসিমা, আপনি ত সবই জানেন। জীবনে কখনো সংসারের মধ্যে থাকতে পারি নি, এমনি দুর্ভাগা আমি। জ্ঞান হয়েই দেখেছি বোর্ডিং হাউসের কড়া শাসনের জীবন। একা একা আলাদা বিছানায় শোয়া। নিজের জামা কাপড়ের যত্ন নিজে করা। একটি শার্ট পরে দিনের পর দিন কাটানো। যখন ক্লাশে প্রাইজ পেতাম তখন একা একা বোর্ডিং-এ ফিরে গিয়ে নিজের প্রাইজগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে রেখে বসে থাকতাম আর আমার মন খারাপ হয়ে যেত। সব ছোট ছেলেই তার প্রাইজ নিয়ে গিয়ে নিজের মাকে বাবাকে দেখায়। ভাবতাম আহা, আমাদের ক্লাশের ভুতো কি গোপাল যদি প্রাইজগুলো পেত তাহলে ওদের বাবা মা ভাইবোনেদের কত আনন্দ হ'ত।

যখন জ্বর হ'ত, একা একা পড়ে থাকতাম তখন মনে হ'ত—যদি কেউ মাথার কাছে বসে থাকত। মাথায় হাত বুলিয়ে দিত। মায়ের স্নেহ যে কি তা জানতাম না, কিন্তু স্নেহের অভাব যে কি সে কি কাউকে বলে-দিতে হয় রানী পিসিমা? ছোট বেলা থেকেই বই-এ, ছবিতে, বন্ধুদের কথায় বার্তায় নানান উপমায় মায়ের সঙ্গে সন্তানের যে কি নিবিড় যোগ ...রানী পিসিমা যখন আরো বড় হলাম, তখন কেবল ভেবেছি সুখ আর বিষয় সম্পত্তি থেকে যিনি আমায় বঞ্চিত করেছেন, আমি কিছুতেই তাকে ক্ষমা করব না। কাকাবাবু কেন একাজ করেছিলেন আমি জানি

না। সুমিতার কি এতই বিষয় সম্পত্তির প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল যে আমাকে পর্যন্ত বঞ্চিত করতে হ'ল। তবে কাকাবাবুর ওপর এই প্রতি-হিংসাতেই আমার আরো বড় আরো ভালো হবার ইচ্ছে হ'ত। আমি ভাবতাম একদিন কাকাবাবুর সামনে গিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াব।

ত্রিদিবেব কথায় বাধা দিয়ে বানী পিসিমা বললেন, তোমাব দুঃখ আমি বুঝি ত্রিদিব। মর্মে মর্মে বুঝি। আমি যখন রায়বাড়িতে এলাম তখন তোমার কাকাবাবুকে বারবার বুঝিয়েছি যে ত্রিদিবের সংগে আপনার আবার যোগাযোগ করা উচিত। আপনি ত্রিদিবকে ডেকে আনুন তাকে বিষয় সম্পত্তিব ন্যায্য ভাগ দিন। খুব সোজাসুজি ত আর বলতে পারতাম না যে, আপনি ত্রিদিবকে বঞ্চিত কবেছেন। এতে পরকালে আপনার ক্ষতি হবে। তবে নানান ভাবে ঘুবিয়ে বলেছি। বার বার বলতে বলতে শেষের দিকে ওঁব মনের অনেক পরিবর্তন হয়েছিল। নাহলে ত সবই প্রায় ঠিকঠাক। কাবখানায় কাজকর্ম দেখত ঐ সরল ও চোখে পড়ে গিয়েছিল ওঁর। ছেলেটি এমনিতে ত খারাপ নয়। ওকে উনি দত্তক নিতে চেয়েছিলেন। তারপর সুমিতাব সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা দেখে ওদের বিয়ে দেবার কথা ভাবছিলেন। সে যা হয় হোক। কিন্তু তোমাকে বঞ্চিত করা ত ন্যায় হত না।

ত্রিদিব ত মাত্রা বিজড়িত কণ্ঠে বলল,

সেই জন্যেই ত বলছিলাম রানী পিসিমা, অনেক কস্টে কেটেছে ছোট বেলাটা, তারপর কাকাবাবু যখন নিয়ে এলেন আপনাদের এই সুখের সংসারে, নিজের ছেলের সম্মান দিয়ে। এখানে এসে আমি অনেক পেয়েছি। আপনাকে পেয়েছি,....হয়ত কোনদিন সুমিতাকেও পেয়ে যেতে পারি। আমি এই শান্তি এই আশা থেকে যেন বঞ্চিত না হই রানী পিসিমা।

এ কথা আমি কাকেই বা বোঝাব। বা কেইবা বিশ্বাস করবে? রানী-পিসিমা আমি বিষয় সম্পত্তির জন্যে এই রায়বাড়ির মাটি-আঁকড়ে নেই।

মাটি আঁকড়ে আছি ছুটো কারণে। প্রথমতঃ এই ঘরোয়া জীবনের শান্তির জন্য। দ্বিতীয়তঃ ভয়ে। রানী পিসিমা ত্রিদিবের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন,

ভয়টা কিন্তু ত্রিদিব তোমার মিথ্যে। কেন মিথ্যে তা আমি তোমাকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারব না, তুমি নিজেই বুঝে নিও।

অনেকক্ষণ ত্রিদিবের মাথার কাছে চুপচাপ বসে রইলেন রানী পিসিমা। তারপর ঘড়িতে দশটা বাজতে উঠে দাড়ালেন, —

চলো, ত্রিদিব, নীচে খেতে চলো। কিন্তু তোমার মুখের ঐ গাম্ভীর্য, ওই মনখারাপের সব ছাপ মুছে ফেলে, তবে নীচে নামবে। সকলের মধ্যে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রানী পিসিমা মৃদু কণ্ঠে বললেন,

—ত্রিদিব একটা কথা তোমায় বলি, কিছু কিছু দুঃখের ব্যাপার আছে, মনের ভিতরের গোপন ব্যাপারগুলো কখনো বাইরে আনতে নেই। কাউকে কথা দিয়ে বোঝাতে যেতে নেই। তাতে সেগুলো খেলো হয়ে যায়। আমিও তোমাকে সেই অনুরোধ করছি ত্রিদিব। আমার নিজের কথাই ধরো না। বড় কষ্টে বড় দুঃখে জীবনের শেষ প্রান্তে এসেই প্রায় সাজানো এই সংসারটি পেয়েছি। হয় ত এভাবে সংসার-জীবন আমি চাই নি। যেভাবে চেয়েছিলাম সেভাবে পাই নি বলে, যে ক্ষোভ আছে সেটাকে চেপে প্রায় মেরে রেখেছি। কারণ বিশেষ করে তোমাকে পেয়েছি, সুমিতাকে পেয়েছি। হয় ত সুমিতার জন্যে একদিন···একদিন সরলকেও আমাকে আপন করে নিতে হবে।

তাই, তোমাদের সবার কাছেই আমার প্রার্থনা আমার এই সোনার সংসারটি যেন না ভাঙে।

সকালবেলা সবে চায়ের পেয়ালাটি সামনে রেখে খবরের কাগজটি খুলে বসেছে শিশির, কে যেন কড়া নাড়ল।

দরজা খুলে দেখে সরল।

সরল হাস্যোজ্জ্বল মুখে ভিতরে ঢুকে এককোণে পায়ের স্যাণ্ডেল জোড়া

খুলে রেখে চেয়ারে বসে বলল,

—বৌদিকে খবর দিন, আর এক পেয়ালা চা।

শিশির পর্দা সরিয়ে ভিতরে বৌদিকে সরলের কথা জানিয়ে এল।

—তারপর সব ঠিক্ ঠাক্ তাই আপনাকে খবর দিতে এলাম।

— যাচ্ছেন ত ?

শিশির বলল,

—হ্যাঁ। ত্রিদিব ত না গেলে ছাড়বেই না।

সরল বলল,

—আমরাই বা ছাড়ব কেন ?

আরে মশাই অত তাচ্ছিল্য করবেন না। দেউলচাঁপা আর সেই গ্রাম নেই। এখন কাকাবাবু আর গভর্ণমেণ্টের হাত পড়ে গ্রামটার চেহারাই পাল্টে গেছে একেবারে।

শিশির বলল,

—আপনাদের কি প্রত্যেক বছরই এইরকম ধুমধাম করে সরস্বতী পুজো হয় ?

—না, এত ধুমধাম করে হত না আগে। এবার থেকে হচ্ছে।

তার কারণ সুমিতা দেশের বাড়ির দুর্গাপুজো বন্ধ করে দিয়েছে। তাই এখন সরস্বতী পুজোতেই যা হবার হবে।

—হঠাৎ দুর্গাপুজো বন্ধ ?

—ওর খামখেয়ালী। যেহেতু কাকাবাবু এই পুজোর আগের পুজোয় বিজয়ার দিন মারা গিয়েছিলেন সেহেতু···। শিশির প্রশ্ন করল,

—মারা গিয়েছিলেন, কি কোনো অসুখে ?

—না, সাপের কামড়ে।

—সাপের কামড়ে ?

—হ্যাঁ। সে এক কাহিনী।

—দেউলচাঁপায় রানী পিসিমারও বাপের বাড়ি। ওঁরা অনেক পুরুষ ধরে

ওখানকার এক চামুণ্ডাকালার পূজারী ছিলেন। সুরেন চক্রবর্তীর ছেলে কমলাপতি চক্রবর্তী কলকাতা থেকে আবার দেউলচাঁপায় ফিরে আসেন উনি ঘোর তান্ত্রিক। ওখানে ছোট্ট একটি আশ্রম করে আছেন। আশ্রমে দুচারটি অনুরক্ত শিষ্য ছাড়া কাউকে যেতে দেন না। কাকাবাবুর গ্রামোন্নয়নের কাজ ওঁর আশ্রম আর তার চারপাশের ঘোর জংগল পর্যন্ত পৌঁছোতে পারে নি। কমলাপতি চক্রবর্তীর ঘোরতর আপত্তিতে থেমে গিয়েছিল। লোকটা মশাই অদ্ভুত। না'হলে এভাবে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল বসায়? ওর ওই আশ্রম আর চারপাশের কষাড় ভাঁট কালকাসুন্দে আর ঘেঁটুব বন ছাড়া আব সব জায়গাতেই ইলেকট্রিকের খুঁটি বসে গেছে। লোকটাব এত প্রচণ্ড বাগ আব হিংসে কাকাবাবুর ওপর যে কাকাবাবু এসেছেন শুনে আশ্রমে মাবণ যজ্ঞ করেছিল। কাকাবাবু কিন্তু অদ্ভুত লোক ছিলেন। তিনি একটুও রাগ করেন নি এসব শুনে। হেসে রানী পিসিমাকে বলেছিলেন,

—দেখো রানী, আমি যে অন্যায় কবেছি তার ত কোনো চারা নেই। কমলাপতি যা করছে তা তার নিজের কর্তব্য অনুযায়ী করছে। তাতে বরং আমারই পাপেব স্খলন হবে।

রানী পিসিমা তবু আমাকে নিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে ওঁর দাদার কাছে গিয়েছিলেন। বাব্বা! কি বিকট চেহারা লোকটার আর কি রাগ কাকাবাবুর ওপর। রানী পিসিমাকেও রেয়াত করলো না। বলল, বেশি বাড়াবাড়ি করলে একেবারে পোষা সাপ ছেড়ে দিয়ে আসব তোমাদের বাড়ি। রানী পিসিমা খুব ভয় পেয়েছিলেন।

শিশির চেয়ারটা সরলের দিকে আরো সরিয়ে এনে বলল,—দারুণ ইন্টারেস্টিং ত, এই পোষা সাপ কিম্বা মারণ যজ্ঞর মানেটা কি?

সরল বলল,

—আমি যদ্দুর শুনেছি মশাই তাতে পুরো ব্যাপারটা গাঁজা ছাড়া আর কিছু নয়। গাঁয়ের দিকে বাটিচালা, বানমারা, সাপচালা এই ধরনের নানান

কথা চালু আছে, শুনেছেন কিনা জানি না। আশপাশের লোকেরা বলত ওই কমলাপতি চক্রবর্তী নাকি ওসবে সিদ্ধহস্ত। ও নাকি মারণ যজ্ঞের বসে যার নামে যজ্ঞ করছে তার নামে একটা নধর কচি চারাগাছকে উৎসর্গ করে সেটাকে যেমন করে পাকিয়ে পাকিয়ে মুচড়ে মুচড়ে ভাঙে ঠিক তেমনি করে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি হাজার মাইল দূরে থাকলেও মুচড়ে মুখে রক্ত উঠে মরবে। সাপচালাও তাই। উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কোনো নিশানা ছুঁইয়ে মন্ত্রপূত সাপকে চালান করে দিলে সেই সাপ ঠিক তাকে গিয়ে ছুবলে আসবে। কাকাবাবুর নাকি ওই চালান করা সাপের ছোবলে মৃত্যু হয়েছিল। অন্ততঃ কমলাপতি চক্রবর্তী ত তাই-ই বলতো। খুব গর্ব করেই বলত। বিজয়াদশমীর দিন সন্ধ্যেবেলা সিদ্ধি খাওয়া খুব জোর চলছিল। কাকাবাবু প্রচুর পরিমাণে সিদ্ধি খেয়ে একটু বেসামালও হয়ে গিয়েছিলেন কেবল বলছিলেন, রানী আজ যদি কমলাপতির ওখানে বিজয়াদশমী করতে যাই, কমলাপতি যতই মারণ যজ্ঞ করুক ঠিক আমাকে কোলাকুলি করবেই।

আমরা অনেক নিষেধ করলাম। সুমিতাকে দিয়েও বলালাম অনেক করে। কাকাবাবু তখন কথা দিলেন সরস্বতী-খালের জঙ্গলে যাবেন না। তিনিও আমাদের সঙ্গে ভাসান দেখতে বেরুলেন। তারপর ভিড়ের মধ্যে কখন আলাদা হয়ে সরস্বতীর জঙ্গলে গিয়েছিলেন আমরা কেউ জানতেও পারি নি। ওঁর সাপে কাটা নীল মৃতদেহটি পাওয়া যায় রাত আড়াইটের সময় অনেক খোঁজাখুঁজির পর।

যাক্ এবার উঠি শিশিরবাবু। কথাটা জানাতেই এসেছিলাম যে সব ঠিকঠাক্। আমরা পরশু রওনা হচ্ছি।

চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে সরল দরজার কাছে এগোল।

শিশির বলল,

—আশ্চর্য, একথা ত ত্রিদিব আমায় কখনো বলে নি।

সরল প্রশ্ন করল,

—কি কথা ?

—এই—আপনাদের কাকাবাবুর অস্বাভাবিক মৃত্যুর কথা !

—ত্রিদিব ত এই মৃত্যুকে অস্বাভাবিক মনেই করে না ?

— কেন ?

সরল একটু চিন্তা করে বলল,

—আসলে ত্রিদিব ত বিজ্ঞানের ছাত্র। আশৈশব কলকাতায় মানুষ। আমাদের মত ও কমলাপতির ওই মারণ যজ্ঞ টজ্ঞ নিয়ে সামান্যতমও চিন্তা করে নি। তাছাড়া আমি বা রানী পিসিমা কমলাপতির ক্রোধ আর আক্রোশের কথাটা যতটা জানি ততটা ত ত্রিদিব জানত না। সে কি জবাফুলের মত লাল টক্‌টকে চোখ মশাই ! আর রাগে মাথার জটা-গুলো সিংহের কেশরের মত ফুঁসছে। ত্রিদিব কাকাবাবুর মৃত্যুটাকে সাধারণ সাপের কামড়ে মৃত্যু বলেই ধরে নিয়েছে। আর সত্যি কথা বলতে কি ও জায়গাটায় সাপও আছে বিস্তর। সারা দেউলচাঁপা গ্রামটায় এত কার্বলিক আর ফিনাইল ছড়ানো হয় যে সাপগুলোরও ঐ জংগল ছাড়া আর কোথাও যাবারও জায়গা নেই।

অবশ্য আমার কথা শুনে আপনার মনে হতে পারে যে আমি কাকাবাবুর মৃত্যুটাকে অস্বাভাবিক বলে বিশ্বাস করি। তা নয় ঠিক্। তবে খট্‌কাও যে লাগে না তাও নয় শিশিরবাবু। সরল চলে যাবার খানিক বাদেই দরজায় আবার কড়া নড়ে উঠল। শিশির এ কড়ানাড়ার শব্দ বিলক্ষণ চেনে। ভিতরে ঢুকেই ত্রিদিব শিশিরের বিছানায় গড়িয়ে পড়ল।

শিশির তাহ'লে পরশু ঠিক যাচ্ছ ত ?

শিশির চেয়ারে বসে ত্রিদিবের দিকে হাসিভরা চোখ দুটি তুলে বলল,

—কেন যাব না ? নিশ্চয়ই যাবো।

— কোনো কারণেই যেন বাধা না পড়ে।

শিশির মাথা নাড়াল,

—না না বাধা আবার কি ? আমি ত সাত-আটদিনের মত ছুটিও নিয়ে

নিয়েছি।

ত্রিদিব চেয়ারে হেলান দিয়ে মাথাটা এলিয়ে বলল,

—তোমায় গাড়িতে যতক্ষণ না তুলতে পারছি তার আগে আমি একে-বারেই নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।

শিশির একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলল,

—একটু আগে সবল এসেছিল।

ত্রিদিব চমকে উঠে বলল,

—সরল ?- ও এত ঘন ঘন তোমার কাছে আসে কেন ?

শিশির বলল,

—হয় ত ভালোলাগে আমাকে !

—অত ভালোলাগা ভালো নয় শিশিব। সবলকে তুমি চেন 'না।

শিশির বলল,

— ভালোই ত, তাহলে সবলকে ক্রমশঃ চিনব। তবে সরল খুব ফ্র্যাঙ্ক আর ইনফবমেটিভ্, জানো ত্রিদিব।

—বাঃ তুমি ত দেখছি সবল সম্বন্ধে অনেক ভালো ভালো আইডিয়া ফর্ম করে ফেলেছ।

—আইডিয়া ফর্ম করতে হয় না ত্রিদিব, আপনা থেকেই হয়।

ত্রিদিব বলল,

—সরল নিশ্চয়ই আমার সম্বন্ধে তোমায় কিছু ইনফরমেশন দিয়ে গেল।

শিশির মাথা নেড়ে বললে,

—মোটেই না। ও তোমাব কাকাবাবুর মত্যুব সম্বন্ধে আমাকে কিছু ইনফরমেশন দিয়ে গেল।

ত্রিদিব বলল,

—জানতাম। একটা স্বাভাবিক ব্যাপারকে অস্বাভাবিক করে তোলবার দিকে সরলেব ঝোঁক ঠিকই যাবে। ইস্যুটাকে বেশ গুলিয়ে দিয়ে ও সুমিতার ব্যাপার থেকে তোমার চোখ সরিয়ে আনবে।

—তোমার কাকাবাবুর মৃত্যু সম্বন্ধে তোমার কি মত?

—সাপের কামড়। তুমিত কখনো দেউলচাঁপায় যাও নি, তাহলে বুঝতে পারতে। একদিন একা বেড়াতে বেড়াতে সরস্বতী খালের দিকের জঙ্গল-টায় ঢুকে পড়েছিলাম। ঢুকে বেশ লাগল। জঙ্গল, কিন্তু ফুলে আর লতায় ঢাকা। একেবারে নিবিড় সবুজ লতায় লতায় জড়াজড়ি ব্যাপার। হাঁটতে হাঁটতে সেই চামুণ্ডাকালীর ভাঙা দেউলের কাছ পর্যন্ত চলে গিয়ে-ছিলাম। কি অদ্ভুত ভাঙা মন্দির। মনে হয় মন্দিরের চূড়া থেকে খানিকটা কেউ মুচড়ে ছিঁড়ে চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। ভাঙা থাম দেওয়াল আর সিঁড়ি সব কতরকমের যে লতা শ্যাওলা ঘাস আর ফুলে ঢাকা। ঝাঁকার মত। আর অজস্র গর্ত। বেশির ভাগ গর্তের মুখেই সাপের খোলস। আমি নিজের চোখে দেখলাম পেকে হলুদ হয়ে যাওয়া একটা দুধে গোখ্‌রো একটা গর্ত থেকে বেরিয়ে সর সর করে চলে যাচ্ছে। আমি একটা গাছের ডাল তুলে গোখ্‌রোটাকে মারতে যাচ্ছি তখন হঠাৎ পিছনে লাল টকটকে ধুতি চাদর পরা অদ্ভুত রাগি চেহারার একটা লোক দাঁড়িয়ে আমার হাতটাকে লাঠিসুদ্ধ ধরে ফেলল।

—খবরদার, ও সাপ আমাদের বাস্তু সাপ ওকে মারবে না!

আমি সাহস করে বললাম,

—কে মশাই আপনি?

তুমি কে মশাই? পালটা প্রশ্ন করল লোকটা। তারপর ধমকে বলল,

—খবরদার আমাদের এদিকে পা বাড়াবে না। যত সব কলকাতার বাবু। এ বনের সাপেরা আমার বাস্তু সাপের বংশ। ওদের গায়ে লাঠি ঠেকালে তোমার চোদ্দ পুরুষ নরকস্থ হবে তা জানো?

আমি আর কি বলব। যত সব মূর্খ সংস্কারাচ্ছন্ন লোক। লোকটা যদি নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করতে চায় তা'হলে আমি আর কি বলব। সাপ কি শত্রুমিত্র বেছে বেছে কামড়ায়। ঐ সব লোককে ভাই চৌরাস্তায় মোড়ে দাঁড় করিয়ে চাবুক মারা উচিত।

শিশির ত্রিদিবের বলার ভঙ্গিতে হেসে উঠল। তারপর বলল,

—লোকটা কি কমলাপতি চক্রবর্তী?

—হ্যাঁ পরে জেনেছিলাম। লোকটা রানী পিসিমার নিজের ভাই। কিন্তু তোমায় আমি বলছি শিশির কাকাবাবুর মৃত্যুটা সত্যিই এ্যাকসিডেন্ট্।

—কারণ?

কারণ, সাপ চালান টালানে আমি বিশ্বাস করিনে।

—তা' না হয় করো না, কিন্তু কমলাপতি চক্রবর্তী ঝাঁপিকরে সাপ এনে ছেড়েও ত দিতে পারে।

—না ভাই তা হয় না। লোকটা তান্ত্রিক, কিন্তু সাপুড়ে ত আর নয়। শিশির বলল,

—তা সত্যি! তা তোমার কাকাবাবুর কি পোস্টমর্টম হয়েছিল।

—নাঃ, সাপের কামড়ের পরিষ্কার চিহ্নও ছিল। শরীর নীল। মুখে জল ভাঙা। কাকাবাবুকে পোড়ানোই হয়েছিল।

অনেকদিন বাদে কলকাতার বাইরে বেরোল শিশির। ভোরবেলায় রায়-বাড়ি থেকে নিজের গাড়িতে করে সরল শিশিরকে রায়বাড়িতে নিয়ে এসেছিল। রানী পিসিমা, সুমিতা, ত্রিদিব, নিভা আর সুমিতার দুজন বান্ধবী অলকা আর ইলা শিশিরের জন্য অপেক্ষা করে ছিল। সকলের সঙ্গে বসে বেশ প্রচুর পরিমাণে জলযোগ করে নিয়ে গাড়িতে উঠেছিল সবাই।

বেশ লাগছে এখন। চলন্তগাড়ির জানলার ধারে বসে শীতের সোনালী রদ্দুরে কলকাতার শ্রীহীন মূর্তিটিও যেন সোনায় মোড়া। তা ছাড়া শিগগিরই কলকাতা ছেড়ে যাবে এই আনন্দেই কলকাতাকে আর তেমন শ্রীহীন লাগছিল না।

গাড়িতে বসে, গাড়িতে বসার জন্য প্রায় আধঘণ্টা ধরে যেসব ছেলেমানুষী ঝগড়া হচ্ছিল সে কথাগুলো মনে মনে নাড়াচাড়া করে ত্রিদিব-দা হেসে

আর পারছিল না। খাবার টেবিলে ত্রিদিব অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে সুমিতার পাশে বসেছিল। সুমিতা কিন্তু ত্রিদিবের দিকে লক্ষ্যই রাখছিল না। সে ক্রমাগত তার বান্ধবীদের সঙ্গেই হাসাহাসি করে যাচ্ছিল। এমনকি টেবিল পেরিয়ে ওপারে সরলের সঙ্গেও মাঝে মাঝে কথা বলছিল। আর বেচারী ত্রিদিব যতই হাসিহাসি মুখ করে থাকুক না কেন, শিশির মনে মনে বুঝতে পেরেছিল, ত্রিদিব মনে মনে খুবই মুষড়ে পড়েছে।

শিশিরের এক-এক সময় ইচ্ছে হচ্ছিল ত্রিদিবকে একটা টিপ্‌স দেয়। সুমিতা দারুন খামখেয়ালী মেয়ে। পুরুষ মাত্রকেই ও হাতের মুঠোয় রাখতে চায়। ফ্লার্ট নয়। এমন ধরনের মেয়ে কোন পুরুষের অমনোযোগ সহ্য করতে পারে না, এই আর কি। কিন্তু হয় ত টেবল ঘুরে যেত, যদি ত্রিদিব সুমিতার প্রতি কোনোরকম মনোযোগ না দিয়ে অন্য মেয়েদের সঙ্গে কথা বলত। কিন্তু শিশির কিছু বলে নি। প্রথমতঃ সে বিশেষ কথাবার্তা বলে না। দ্বিতীয়তঃ, এক্ষেত্রে ব্যাপারটা স্বাভাবিক পথে যেতে দেওয়াই ভালো। এই তার বিশেষ ধারণা।

রায়বাড়ির গাড়িবারান্দায় সার সার তিনটি আরামপ্রদ স্টেশন ওয়াগন অপেক্ষা করছিল। ঠাকুর চাকররা আগেই দেউলচাঁপায় চলে গিয়েছে। কলকাতা থেকে যাচ্ছে আরো কয়েকজন বিশ্বস্ত চাকর বাকর আর ম্যানেজার বাবু। তাঁর সঙ্গে যাচ্ছে কিছু পূজোর সরঞ্জাম। এঁদের জন্য একটি স্টেশন ওয়াগন বরাদ্দ। আর দুটিতে ভাগাভাগি করে একটিতে যাবে ছেলেরা অন্যটিতে যাবে মেয়েরা। সুমিতা কিন্তু বায়না ধরল শিশির তাদের সঙ্গে যাবে। সেই সঙ্গে তার বন্ধুরাও যোগ দিয়েছে। শিশির আড়চোখে লক্ষ্য করছিল ত্রিদিব অতিকষ্টে আত্মসম্বরণ করছে। সরলও ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল, শিশিরের সঙ্গে চোখে চোখ মিলতেই, চোখ টিপে ইশারা করে বলল তার চেয়ে শিশিরবাবু আপনি আর ত্রিদিব রানী পিসিমার সঙ্গে যান আর আমি বরং সুমিতাদের সঙ্গে যাই।

এবার রানী পিসিমাও হেসে ফেললেন। অথচ ত্রিদিবের কিন্তু সেদিকে লক্ষ্যই নেই। সরল মেয়েদের গাড়িতে যাচ্ছে শুনে তার চোখমুখের রঙই পালটে গিয়েছে।

শেষ পর্যন্ত রানী পিসিমাই সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দিলেন। তাঁর সঙ্গে যাবে ত্রিদিব আর সরল। আর মেয়েদের সঙ্গে শিশির।

তিনি বললেন,

—কি করা যাবে ? ওরা যখন আব্দার ধরেছে তখন ওদের সঙ্গে শিশিরই যাক্।

ত্রিদিব বোকার মত বলল,

—আমিত সেই কথাই বলছিলাম। আমি রানী পিসিমার সঙ্গে যেতে চাই। চলো সরল আমরা গান গাইতে গাইতে যাই। আমরা নতুন যৌবনেরি দূত…

ত্রিদিব সরল আর রানী পিসিমাকে নিয়ে স্টেশন ওয়াগনটা আচম্‌কা বেরিয়ে যেতেই মেয়েরা খিলখিল করে হেসে উঠল। আর শিশিরকে নিয়ে স্টেশন ওয়াগনে উঠল।

চারটি উশৃঙ্খল চঞ্চল মেয়ে আর একলা শিশির। আর হু হু হাওয়া। গতির আনন্দ। তবে মনের মধ্যে একটা অস্বস্তিও ঘুরছিল শিশিরের। বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলের যে স্বাভাবিক অস্বস্তি হয়, চারটি তরুণী মেয়ের সান্নিধ্যে এলে। শিশির খুব একটা বেশি কথা বলতে পারে না বলে প্রথমদিকে চুপচাপ ছিল। ক্রমশ সুমিতাই কথা বলতে শুরু করল। সুমিতার একটি প্রধান গুণ হল তার সরল সহজ আর আন্তরিক কথা বলার মনোরম ভঙ্গি। ক্রমশ অলকা আর ইলাও যোগ দিল। বাংলাদেশের দুচারজন পদ্য লেখকের কথা জিজ্ঞেস করার পর ওরা সোজা চলে এল সিনেমা প্রসঙ্গে। অনেকক্ষণ গল্প করার পর ক্রমশ সকলের খেয়াল হ'ল নিভা বিশেষ কোনো কথা বলছে না। সুমিতা তাকে দলে আনবার জন্য

নিভা, তোমার প্রিয় অমর্ত্য চ্যাটার্জির কথা হচ্ছে। কলেজস্ট্রীট কফিহাউসে প্রত্যেক বুধবার সন্ধ্যা সাতটার সময় গেলে ওঁকে দেখতে পাবে। জানেন শিশিরবাবু নিভা, ওর শাড়ির ট্রাঙ্কের মধ্যে সবচেয়ে ভালো শাড়িটির ভাঁজে অমর্ত্য চ্যাটার্জির ছবি রাখে।

শিশিরের নিভার প্রতি সহানুভূতি হচ্ছিল। আশ্চর্য! সুমিতার এটা একটা অদ্ভুত স্বভাব। মোটেই প্রসংশনীয় নয়। নিভার সব গোপন কথা দুর্বলতা ও বলে দেয়। নিভা ওদের অধীনে চাকরি করে কিন্তু সেও ত একটি মেয়ে। ওই সুমিতারই প্রায় সমবয়সী। কিন্তু সুমিতা সব সময়েই নিভার সঙ্গে যেন প্রতিদ্বন্দ্বিনীর মত ব্যবহাব করে।

নিভা সুমিতাব কোনো কথার উত্তর দিল না। শুধু ওর মুখের কোমল ডৌলে একটা চাপা বেদনা ফুটে উঠতে দেখল শিশিব। এই প্রথম লক্ষ্য করল নিভাও কম সুন্দবী নয়। গভীব কালো দুটি চোখ। সরু অথচ নিবিড় কালো ভ্রূ।

নিভা বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকলেও, সুমিতা কিন্তু তাকে ছাড়ছিল না। সে কেমন যেন উদ্ধত হয়ে উঠেছিল। সুমিতা কিন্তু সমানে নিভাকে খুঁচিয়ে যাচ্ছিল।

—কি ব্যাপার নিভা! হঠাৎ যে চুপ হয়ে গেলে?

নিভা চোখ ফিরিয়ে বলল,

—না না ব্যাপার আর কি?

—তবে? এ গাড়িতে ভাল লাগছে না বুঝি?

অলকা আর ইলা সুমিতার কথা বলার ভঙ্গিতেই সুমিতার সূক্ষ্ম ইঙ্গিতটুকু বুঝে ফেলল।

অলকা বলল,

—হ্যা নিভা তুমি বরং বেশ পরিষ্কার করে বলে দাও তোমার মন খারাপ হওয়ার আসল কথাটা।

ইলাও যোগ দিল,

—হ্যাঁ ঠিক কোন জনটি তোমার মন খারাপের কারণ বলে দিলে সুমিতাও ত খানিকটা নিশ্চিন্ত হতে পারে।

নিভা বলল,

আমি কেন বলব? তার চেয়ে সুমিতাই বলুক না ওর নিজের কথা। আমিই বা সব সময় আমার নিজের কথা জাহির করতে গেলাম কেন? তার চেয়ে সুমিতাই ওব নিজের গোপন কথাটা বলুক না কেন?

হাজাব হোক সুমিতার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। তাছাড়া নিভার এই ঔদ্ধত্য আব ক্রোধের বিস্ফোরণ সকলের কাছেই কিছুটা অপ্রত্যাশিত। কিছুক্ষণ সবাই স্তম্ভিত, স্তব্ধ হয়ে রইল।

শিশির আড়চোখে লক্ষ্য করল সুমিতা অলকা আর ইলার চোখে প্রথমে বিস্ময় এবং পরে ক্রমশঃ অনুতাপ ফুটে উঠছে। সুমিতা খানিকবাদে নিভার সিটে গিয়ে বসল। চাপা গলায় নিভাকে কি বলতে লাগল কে জানে? হয় ত ক্ষমা প্রার্থনাই করছিল সুমিতা। নিভা এবার প্রায় ফুঁপিয়ে উঠল।

—সুমিতা আমার একদম কিচ্ছু ভালো লাগছে না। আমার শরীবটাও ভালো নেই বড় কষ্ট হচ্ছে। দয়া করে তোমাদের ঐ সব নিষ্ঠুর ঠাট্টা থেকে আমাকে রেহাই দাও।

অলকা আর ইলাও ততক্ষণে সরে গেছে নিভার কাছে।

শিশির আর ওই অপ্রীতিকর পবিবেশের দিকে তাকাল না। যেন সে কিছুই শুনতে পায় নি কিম্বা বুঝতে পারে নি কিম্বা তার কিছুই এসে-যাচ্ছে না এমনি ভাব কবে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

এখন ওরা শহর ছাড়িয়ে অনেকখানি চলে এসেছে। ফাঁকা মাঠ আর গাছ আর জল। শীতের সকালের নরম রোদে শাপলা ভরা বিলগুলি ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। এই রাস্তা সোজা চলে গেছে দেউলচাঁপার দিকে। সামনের গাড়িতে যাচ্ছেন রানী পিসিমা। ফিরছেন তাঁর বাপের বাড়ির গাঁয়ে। একদিন রানী পিসিমা এই রাস্তা দিয়েই একা দেউলচাঁপা গ্রামটি

ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। তখন কি এই রাস্তা এমনি পীচে মোড়া ছিল? শিশিরের কল্পনা করতে ইচ্ছে করছিল। তখন রানী পিসিমা ঠিক কেমন দেখতে ছিলেন। তিরিশ বছর আগে একদিন সকালে রানী পিসিমা ঐ গ্রাম থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন ছোট্ট একটি স্যুটকেস হাতে করে। সে গল্প শিশির একদিন রায়বাড়ির প্রশস্ত বাগানের লনে বসে সুস্মিতার কাছে শুনেছিল। শুনে শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে তার সারা অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

রানী পিসিমার বাবার নাম ছিল সুরেন চক্রবর্তী। তিনি ছিলেন নিশানাথ রায়ের গুরুবংশের উত্তর পুরুষ। ওঁদের বংশে সুরেন চক্রবর্তীই প্রথম এনট্রান্স্ পাশ করে কলকাতায় সংস্কৃত কলেজে পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। তারপর তিনি মাঝে মাঝে গ্রামে ফিরলেও পাকাপাকিভাবে কলকাতাতেই থেকে যান। গোয়াবাগানে একটা ছোট টোল খোলেন তিনি। তাতে সামান্যই আয় হত তাছাড়া একটি স্থানীয় মন্দিরে পুরুতগিরিও করতে হত তাঁকে। সামান্য বস্তীর মত খাপ্‌রার চাল দেওয়া দুখানি ঘর নিয়ে থাকতেন তিনি। দরিদ্র ছিলেন, আচার বিচারও ছিল। অথচ সেই সঙ্গে ছিল দৃষ্টিভঙ্গির উদারতা। তাই নিজের ছোট মেয়ে এবং ছেলেকে তিনি স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। ইংরেজি শিক্ষাকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন।

এই সুরেন চক্রবর্তীর আশ্রয়ে এসে উঠলেন নিশানাথ রায়। কলকাতায় তখনও সঙ্কীর্ণতা আর স্বার্থপরতার ভাব তেমন প্রবল হয় নি। তখনও দেশ গাঁ থেকে ভাগ্যান্বেষী ছেলেরা কলকাতায় এলে বড়মানুষের বাড়ি, অথবা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি দিব্যি আশ্রয় পেয়ে যেত। নিশানাথও পেয়ে গেলেন। গ্রাম সুবাদের ঘনিষ্ঠতায়। নিশানাথের পেটে তেমন বিদ্যে ছিল না। কিন্তু বিদ্যের বদলে ছিল তীব্র উপস্থিত বুদ্ধি। ঈশ্বরদত্ত স্বাস্থ্য আর চমৎকার পুরুষালী চেহারা ছিল নিশানাথের। আর ছিল বুক ভরা উচ্চাশা। সুরেন চক্রবর্তীকে ধরে করেই কাছাকাছি

লোহার কারখানায় কাজ নিয়েছিলেন তিনি। থাকা আর খাওয়ার পাকা-পাকি ব্যবস্থা হয়েছিল স্থরেন চক্রবর্তীরই বাড়িতে। নিশানাথের কাছ থেকে এইজন্য কোনো অর্থের দাবী করেন নি তাঁরা।

রানী তখন সেকেণ্ড ক্লাশে পড়ছে। উদ্ভিন্না যুবতী। স্থরেন চক্রবর্তীর বাবা তাঁব ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁব বড মেয়েটির বিয়ে দিয়েছিলেন এক অশিক্ষিত গ্রাম্য কুলীন ঘরে। চরিত্রহীন নেশাখোর স্বামীর পাল্লায় পড়ে মেয়েটির স্বাস্থ্য অকালে ভেঙে পড়ে। পবে সে মারা যায়। তাই সেকাল হলেও স্থরেন চক্রবর্তী রানীকে উপযুক্ত শিক্ষা না দিয়ে বিয়ে দেবার কথা ভাবছিলেন না। নিশানাথের সঙ্গে রানীর ঘনিষ্ঠতা এবং শেষ পর্যন্ত প্রেম হওয়ায় কোনো বাধা ছিল না। দুজনে গোপনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে বানীব ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা হয়ে যাবার পর পালিয়ে গিয়ে বিয়ে হবে। কারণ নিশানাথ রায় কায়স্থ। নিশানাথেরও আশা ছিল ইতিমধ্যে তাঁর একটা প্রমোশন হয়ে যাবে। কারণ নিশানাথেব কাজে তাঁর মনিব এমনিতেই খুব খুশি ছিলেন। বানীব কাছে নিশানাথ সব কথাই বলতেন।

প্রমোশন পাবার জন্য নিশানাথ যখন মনিবকে আরো বেশি মাত্রায় খুশি কবার জন্য পাগলের মত চেষ্টা করছেন তখন নিশানাথ এমন সাফল্য দেখালেন যে মনিব একেবারে স্তম্ভিত। কারখানায় একটা চুল্লী বার্স্ট করে গিয়ে জনতিনেক শ্রমিক মারা যায়। শ্রমিকরা একজোট হয়ে বোধ-হয় ক্ষতিপূরণের দাবী করেছিল।

প্রমোশনের লোভে নিশানাথ মালিকের পক্ষ নিয়ে এই জোটভাঙা আর দলভাঙার ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়ে মৃত শ্রমিকদের পরিবারগুলিকে বঞ্চিত করিয়েছিল। তারপর থেকে মালিক তাঁকে ঘন ঘন ডাকতেন কিম্বা তিনি নিজেই নানান ছুতো করে ঘন ঘন যেতে আরম্ভ করলেন মালিকের বাড়ি।

শিশির স্থমিতাকে তার নিজের বাবার সম্বন্ধে ঐ ভাবে কথা বলতে দেখে খানিকটা আহতই হয়েছিল কাহিনীর মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলেছিল,

— থাক্ অপ্রিয় অতীতের কবর আর নতুন করে খুঁড়ে লাভ কি ?

সুমিতা বুদ্ধিমতী মেয়ে। হেসে বলেছিল,

—বুঝেছি। আপনি আমার মুখে আমার বাবার জীবন সম্বন্ধে কতক-গুলো সত্যি কথা শুনে আহত বোধ করছেন, তাই না ?

শিশির বলেছিল,

—না, তা ঠিক নয়, তবে নিজের খুব ঘনিষ্ঠ গুরুজন সম্বন্ধে এই রকম নিরপেক্ষ ভাবে···

সুমিতা শিশিরকে বাধা দিয়ে বলেছিল,

—আমার বাবাও যে ঐ ভাবেই কথা বলতেন। তিনি বলতেন পাপের ক্ষয় হয় অনুতাপে আর কনফেশ্যনে। আর তাছাড়া ফাঁপা সেন্টিমেণ্ট্ নিয়ে আমরা কেন পড়ে থাকব শিশিরবাবু। শত হলেও ভালোয় মন্দয় মিলিয়ে আমরা সবাই এক একটা গোটা মানুষ হয়ে উঠি। আমার বাবার খারাপ দিকের কথাটাও যেমন বলছি আপনাকে তেমনি ভালো দিকের কথাও বলব। বাদ দেব না।

সুমিতা তারপর তার গল্পের ছেঁড়া সূত্রটা আবার জুড়ে নিয়েছিল। মনিবের বাড়ি নিয়মিত যাওয়া আসা করে করে যেমন মনিবের স্নেহ আকষণ করছিলেন নিশানাথ তেমনি মনিব কন্যারও হৃদয় আকর্ষণ করেছিলেন। মনিবকন্যা ছিলেন সুরূপা, কনভেণ্টে পড়া মেয়ে। ছবির মত করে সেজে বাগানে ঘুরে বেড়াতেন, কিম্বা পিয়ানো বাজাতেন। রোজ রোজ নানান নতুন নতুন অবকাশ যাপনের প্ল্যান কষতেন তিনি সারাদুপুর নরম ঠাণ্ডা আলোয় ভরা শোয়ার ঘরে শুয়ে শুয়ে। কোনো কোনো দিন চাঁদের আলোয় ভাসা অনেক রাত্রি ধরে বহুদূর গাড়িতে ঘুরে আসা, সন্ধ্যায় বাইরে খেতে যাওয়া, পার্টি, নাটক দেখতে যাওয়া কিম্বা সিনেমা···

সময় হু হু করে বয়ে যেত। নিশানাথ তখন দুরন্ত উচ্চাশায় ভরা যুবক। তখন কোথায় কোন্ গোয়াবাগানের গলিতে কে টেমি জ্বালিয়ে শেমিজের

ওপর লালপাড় শাড়ি জড়িয়ে তাঁর খাবার কোলে করে বসে আছে একথা ক্রমশই ভুলে যেতে লাগলেন নিশানাথ।

তাঁকে পৌঁছে দিতে আসতেন মনিবকন্যা নিজে। গলির মধ্যে অতবড় রোলস্‌রয়েস গাড়িকে ঢোকাতে বের করতে তাঁর শোফারের যথেষ্ট অসুবিধা হ'ত। তাছাড়া আশ্রয়দাতার খোলার চালের দরিদ্র বাড়িটা দেখাতেও লজ্জা হত নিশানাথের। শেষ পর্যন্ত তাই, নিশানাথ গোয়াবাগানেব আশ্রম থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হলেন।

তখন রানীব পরাক্ষা চল্‌ছে।

সুবেন চক্রবর্তী বানীর ভেঙে পড়া মন চেহারা আর অবিবাম কান্না দেখে বুঝে ফেললেন সব। রানীর এতদিন ধরে চেপে রাখা ভালোবাসাব গোপনতা সব খুলে গেল। বেরিয়ে এল দিনের আলোয়।

রানী পরীক্ষায় পাশ কি ফেল দেখবার আগেই নিশানাথের দুর্ব্যবহারের আঘাতে জর্জরিত হয়ে সুরেন চক্রবর্তী কলকাতা ছাড়লেন। গোয়াবাগানেব বাসা তুলে দিলেন। আবার ফিরে গেলেন দেউলচাঁপায়। রানী কিন্তু বেশিদিন দেউলচাঁপায় রইলেন না। ম্যাট্রিক পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোনোর রাতেই তিনি একটি স্যুটকেশে সামান্য দু' একখানি জামাকাপড় আর টাকা ভরে নিরুদ্দেশ হলেন।

দু'বছর বাদে আবার খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল রানীর। আই. এ. পরীক্ষা-দিতে কলকাতায় এসেছিলেন রানী। সেখানে দেউলচাঁপার কোনো চেনা লোকের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে গিয়েছিল। তার কাছে রানী বলেছিলেন যে রাঁচিতে একটি মিশনারি স্কুলে তিনি একটা কাজ পেয়ে গিয়েছেন। অবশ্য রানীর মত গৃহত্যাগিনী মেয়ের আর কোনো খোঁজখবর করেন নি তাঁর বাবা।

রাঁচির সেই স্কুলেই সারাজীবন টিচারী করে কাটিয়ে দিয়েছিলেন রানী পিসিমা। চিরকুমারী তিনি। আর রোমান্স্‌ কিম্বা বিয়ের পথে পা বাড়ান নি।

এদিকে নিশানাথের সঙ্গে ধুমধাম করে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল তাঁর মনিব-কন্যার সঙ্গে। নিশানাথ আর অমিয়া। তারপর নিশানাথ যা চেয়েছিলেন তাই পেয়ে নিজের প্রবণতায় কারখানা ব্যবসা সবই বাড়িয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুললেন। রঁাচির স্কুল থেকে অবসর নিয়ে নিজের সারাজীবনের জমানো সম্বল দিয়ে রানী ছোট্ট একটি বাড়ি তৈরী করলেন চন্দননগরে। একতলা টালিচাল দেওয়া ছোট্ট একটি মাথাগোঁজার আশ্রয়।

রানী পিসিমার সঙ্গে পুবীব সমুদ্রের ধারে হঠাৎ নাটকীয়ভাবে দেখা হয়ে গেল নিশানাথের। কত বছর পাব হয়ে আবাব দেখা। প্রায় বত্রিশ-তেত্রিশ বছর পর।

সমুদ্রের ধারে প্রতিদিন তুজনেব দেখা হ'ত। সঙ্গে থাকত সরল আর সুমিতা। কখনো কখনো সরল সুমিতা উঠে চলে যেত, তখন তুজনে সমুদ্রের ধারে অস্তমিত সূর্য সন্ধ্যার গালচের ওপর বসে সারা জীবনের জমা খরচ প্রাপ্তি আর বঞ্চনার হিসেব কষতেন হয় ত। মাতৃহীন সুমিতাও আঁকড়ে ধরেছিল রানী পিসিমাকে। নিশানাথের সংসারে ঠিক এমনি একটি কল্যাণী মহিলারই অভাব ছিল। পুরী থেকে নিশানাথ সরল আর সুমিতাকে নিয়ে রানী পিসিমা একবার ফিরে এসেছিলেন তাঁর চন্দননগরের বাড়ি। তারপর বাড়িটা ভাড়া দিয়ে চিরকালের মত থাকতে চলে গেলেন রায়-বাড়িতে।

রানী পিসিমার পা পড়তেই রায়বাড়ির চেহারা পাল্টে গেল যেন। নিশানাথের শেষ জীবনটা সেবায় যত্নে একেবারে পরিপূর্ণ করে তুললেন রানী পিসিমা। আর মাতৃহীন জীবনে আবার পড়ল যত্ন আর স্নেহের কোমল ছায়া।

কাহিনী শেষ করে সুমিতা গাঢ় কণ্ঠে বলেছিল—বাবা রানী পিসিমার ছোঁয়ায় আবার যেন নতুন করে সঞ্জীবিত হয়ে উঠলেন। তাঁর মধ্যে অনেক পরিবর্তন এল। তিনি আমার আর সরলদার মধ্যে তাঁর বিষয় ভাগ করে দিলেন। সরলদার একভাগ আর আমার তিন ভাগ।

অথচ রানী পিসিমাকে কিন্তু কিছুতেই একটি পয়সাও মাসোহারা নেওয়াতে পারেন নি বাবা।

রানী পিসিমা পরে আমাকে বলেছিলেন যে বাবা নাকি সরলদাকে অর্ধেক সম্পত্তি দিতে চেয়েছিলেন। রানী পিসিমাই তাঁকে বারণ করেন। আসলে বাবার ইচ্ছে ছিল আমার সঙ্গে সরলদার বিয়ে দেবেন। রানী পিসিমা বলেছিলেন শেষ পর্যন্ত কি হবে কেউ জানে না। আজ হয় ত সরলদা ভালো আছে, কালকে না'ও থাকতে পাবে। তাই এখন থেকেই ত আর সরলদার সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক করা যায় না। অবশ্য বিষয় সম্পত্তির কথা আলাদা। তারপর বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ত্রিদিব-দার। ত্রিদিবদা থাকতে এলেন আমাদের বাড়িতে।

রানী পিসিমা আবার বাবাকে অনেকভাবে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আবাব নতুন করে উইল করান। রানী পিসিমা আমাকে সব বলেছিলেন। বাবা শেষ বার যখন উইল পালটালেন তখন দেখা গেল আমাদের তিনজনের ভাগ সমান সমান। রানী পিসিমার জন্য ত্রিদিবদাও সম্পত্তি ফিরে পেয়ে-ছিলেন।

শিশির সিগারেট ধরিয়ে সেই বঞ্চিত মহিলাটিব কথা ভাবছিল। সারাটা জীবন কেবল বঞ্চনা আর বঞ্চনা। নিঃসঙ্গ থেকে শেষ জীবনের দিন-গুলিতে ঈশ্বর অপর্যাপ্ত সুখে ভরিয়ে দিয়েছিলেন তাঁকে। বাসনা ক্রোধ বঞ্চনার আঘাত যখন সবই জুড়িয়ে গিয়েছে, তখন আবার নিশানাথের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে গিয়েছিল। নিশানাথের ঘরে, এই বয়সে এসে উঠলে কেউ আর কোনো নিষিদ্ধ সম্পর্কের বদনাম দিতে পারবে না, তা তিনি বুঝতেন। আর দিলেই বা কি? বদনামের বদলে তিনি যদি দুটি ছেলে আর একটি মেয়ের ভরন্ত একটি সংসার পেয়ে যান, তার কাছে ত আর সবই তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর হয়ে যাবে। আর একটা সুবিধে ছিল টাকা। প্রচুর টাকা। টাকা এমন জিনিষ, যে তাতে সব কলঙ্কই ধুয়ে মুছে সাফ করে দেওয়া যায়। দেউলচাঁপার একমাত্র রতন

চক্রবর্তী ছাড়া আর সবাই-ই প্রায় রানী পিসিমা বলতে অজ্ঞান। তবে দুর্ভাগ্য এই, যে সেবায় যত্নে পরামর্শে যিনি নতুন মানুষ হয়ে উঠেছিলেন, তিনিই আর রইলেন না। নিশানাথ মারা গেলেন।

শিশির বাইরের দিকে তাকিয়ে রানী পিসিমার কথা ভাবছিল। গাড়ি-গুলো এবার বড় রাস্তা ছেড়ে অপেক্ষাকৃত সরু রাস্তায় মোড় নিল। লতায় পাতায় নিবিড় কচি বাঁশঝাড়ের হালকা বিস্তারের মাঝ দিয়ে এবার ধূলোওড়া লালমাটির রাস্তা।

শিশির লক্ষ্য করল নিভা আবার স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে। ইলা আর অলকার সঙ্গে গল্প করছে। সুমিতা শিশিরকে বলল,

—শিশিবাবু, দেখুন, প্রায় এসে গিয়েছি। ওই আমাদের বাড়ির চিলে কোঠার কার্নিশ।

শিশিব দেখল সদ্য হলুদ রঙ্ করা চক্‌মেলানো বাড়ি। ধাঁচটা পুরানো হলেও সংস্কারের হাত পড়ে প্রায় নতুনের মত চেহারা নিয়েছে।

সুমিতা বলল,

—ওই দেখুন আমাদের চণ্ডীমণ্ডপের চূড়া। বাবা নতুন করে সব তৈরী করিয়েছিলেন। ঠাকুরদালান মণ্ডপ, সব। শুনেছি আমাদের বংশে দুর্গা-পূজো সয় না। বাবা যে বছর মারা গেলেন, সেই বছরই বাবা আবার নতুন করে ঐ নতুন ঠাকুরদালানে পূজো শুরু করেছিলেন। সত্যি, সইল না।

শিশির প্রশ্ন করলে,

—সাপের কামড়েই মারা গেলেন না?

সুমিতা মাথা নাড়লে।

—বাবা আগের দিন পূজোর ভিড়ের মধ্যে আমাকে আলাদা করে ডেকে বলেছিলেন, দেখ্ সুমি, তুইত আমার বন্ধুর মত, তোকে ত আমার জীবনের সব কথাই বলেছি, আরো অনেক কথা তোকে বলারও আছে। সব বলব। তবে আজকাল খালি মনে হয়, কারো সঙ্গে দ্বেষ বা দ্বন্দ্ব

রেখে লাভ নেই। হিসেব নিকেশ সব মিটিয়ে ফেলাই ভালো।
সুমিতা বলেছিল,
—আমি বাবাকে প্রশ্ন করেছিলাম, হিসেব নিকেশ কার সঙ্গে, বাবা বলেছিলেন সুরেন চক্রবর্তীর সঙ্গে। সুরেন চক্রবর্তী রানী পিসিমার ভাই। বাবা বলেছিলেন ওঁকে তিনি ক্ষতিপূরণ দিতে চান।
শিশির চিন্তান্বিত ভঙ্গিতে সুমিতার দিকে তাকাল। তাহলে কি আপনি বলতে চান সেদিন রাত্রে আপনার বাবা যখন সরস্বতীর খালের জঙ্গলে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে অনেক টাকা ছিল।
সুমিতা চকিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল,
—হতে পারে। শিশিরবাবু, হয় ত তা হতেও পারে।
শিশির এবং সুমিতা আর বেশিক্ষণ কথা বলতে পারল না। গাড়ি এসে ঢুকল রায়বাড়ির গেটে। তারপর বাগান পেরিয়ে ঢালা গাড়িবারান্দাব তলায়।
সুমিতা হঠাৎ উদ্ভাসিত মুখে বলল,
—যাই বলুন শিশিরবাবু নিজেদের দেশে নিজেদের ভিটেয় ফিরে এলে যেমন ভালো লাগে এমন আর কিছুতেই লাগে না। এখন মনে হচ্ছে বম্বে না গিয়ে খুব ভাল করেছি ত্রিদিবদার ইচ্ছে ছিল বম্বে যাই।
সুমিতার কথা শেষ হতে না হতেই, নিভা বিদ্যুৎবেগে সুমিতা আর শিশিরকে ডিঙিয়েই প্রায় নেমে গেল নীচে। সোজা রানী পিসিমার কাছে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বুকে মুখ রাখলো।
রানী পিসিমাও তাড়াতাড়ি সস্নেহে বুকে চেপে ধরলেন নিভাকে। সশঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন,
—কি নিভা, কি হয়েছে মা?
নিভা কান্নাভরা গলায় বলল,
—রানী পিসিমা, আমার বড় শরীর খারাপ করছে। আপনি আমাকে ওষুধ দিন। রানী পিসিমা, ওরা আমাকে কেউ বোঝে না।

রানী পিসিমা সুমিত্রাদের দিকে ফিরে ভৎ´সনার ভঙ্গিতে বললেন,
—সুমি, তোর ছেলেমানুষী আর গেলো না দেখছি। কি যে করিস সব সময়। সত্যি ভালো লাগে না। সুমিতারা অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে রইল। শিশির নেমে সরলদের গাড়ির কাছে গিয়ে জিনিষপত্র নামানো দেখতে লাগল। রানী পিসিমা নিভাকে একহাতে জড়িয়ে নিয়ে বাড়ির ভিতরে যাচ্ছিলেন, এমনি সময় চাকবেবা অসাবধানে কি একটা কাচের জিনিষ ভেঙে ফেলল। সরল ছুটে গিয়ে আয়তাকাব একটি ছবি কাচের টুকরোর মধ্যে থেকে তুলে নিয়ে রানী পিসিমাকে উদ্দেশ করে বলে উঠল,
—ওঃ মা, আমার বাবার ছবির কাচটা ভেঙে গেলো বুঝি!
নিভার ব্যাপাবে রানী পিসিমাব মন এত চঞ্চল ছিল যে তিনি বিরক্তির ভঙ্গিতে শুধু একবাব সরলের দিকে তাকিয়ে নিভাকে নিয়ে ভিতরে চলে গেলেন। অন্যদিন হলে হয় ত রানী পিসিমা এমনটা করতেন না। শিশিরের মনে হ'ল। কারণ তিনিই একদিন সপ্রসংশভাবে শিশিরকে বলেছিলেন যে সরল তার বাবাকে এমন ভক্তি করে যে প্রতিদিন দেবতা পূজাব মত নিয়ম ক'রে তাঁর ছবির সামনে ধূপধুনা দেয়, মালা পরায়। সুমিতা আর ত্রিদিব এগিয়ে এসে সরলের স্যুটকেশের ওপব সযত্নে রাখা ওর বাবার ব্রাউন পেপারে প্যাক করা বাঁধানো ছবিটার দিকে ছুটে এলো সবল তখন হাঁটু গেড়ে বসে ব্রাউন পেপাবটা ছিঁড়ে ফেলে একটি একটি করে ভাঙা কাচের টুক্‌রো খুঁটে খুঁটে তুলছে।
শিশির বিস্মিত হয়ে দেখল অমন শক্ত সমর্থ মানুষটার মুখের রেখাগুলো কান্নার আঘাতে একেবারে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। আর চোখের জলের বড় বড় ফোঁটা টপ্ টপ্ করে ঝরে পড়ছে ছবিটার কাচগুলোর উপর। সুমিতা পরম মমতায় সরলের পাশে বসে তার কাঁধে হাত রেখে বলল,
—সরলদা, লক্ষীটি, আসল ছবিটা ত ঠিকই আছে। কাচটা আবার বসিয়ে নিলেই ত নতুন হয়ে যাবে।
শিশির দেখল সুমিতার কথার সঙ্গে সঙ্গেই ত্রিদিবের কোমল ভঙ্গিতে

আবার একটা অদ্ভুত কাঠিন্য এলো। সে নিজের অজান্তেই পিছু হঠে বাড়ির মধ্যে আস্তে আস্তে ঢুকে গেল।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর লম্বা ঘুম দিয়ে উঠে শিশির দেখল তাকে বাদ-দিয়েই জমজমাট চায়ের আসর বসে গেছে। দু'সারি ঘরের মাঝখানে টানা লম্বাছাঁদের দালান। আগাগোড়া শ্বেত পাথরে মোড়া। মাঝখানে পাথরের চৌকা টেবিলে চা আর বিকেলের জলখাবারের পাহাড় প্রমাণ আয়োজন। শিশির চোখ মুখ ধুয়ে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল।
সুমিতা হেসে এক প্লেট্ শুকনো মেওয়া আর কাজুবাদাম ভাজা এগিয়ে দিয়ে বলল,
—কলেজে কি এই ভাবেই পড়ান আপনি ?
অলকা বলল,
—হ্যাঁ হ্যাঁ এর আবার জিজ্ঞেস করবার দরকার কি, দেখছোনা পুরোনো অভ্যেস !
ইলা আবার ফুট্ কাট্‌লো,
—আহা তেমন দশটা পাঁচটা পুরো আট ঘণ্টা হল না। শিশিরবাবু চা টা খেয়ে বরং বাকিটা সেরে নিন গিয়ে।
রানী পিসিমা শিশিরকে চায়েব পেয়ালটা এগিয়ে দিতে দিতে বললেন,
—দেখেছ, মেয়েগুলোর কি রকম সাহস বেড়েছে।
এ-বেলা আবার শিশিরকে নিয়ে পড়েছে। একটু সমীহ নেই।
তাঁর কথার ভঙ্গিতে সবাই হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল।
সুমিতা বলল,
—নিন শিশিরবাবু আপনিও এবার রেগে যান। বলুন—আমায় কেউ বোঝে না। সবাই আমার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করে।
শিশির সুমিতার অন্তর্নিহিত ক্ষোভের কারণটা বুঝতে পারল।
সরল এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল,

—আরে, সত্যিই ত, নিভা কি এখনো রাগ করে আছে নাকি? ও কি শেষ পর্যন্ত আমাদের বয়কটই করল।
ত্রিদিব ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলল,
—তুমি এতক্ষণে লক্ষ্য করলে সরল, যে নিভা চায়ের টেবিলে আসে নি?
সরল বলল,
—হ্যাঁ ত্রিদিব। আমার অপরাধ হয়ে গেছে ভাই! সরি!
সরলের কথার ভঙ্গিতে আবার মেয়েরা হেসে উঠল।
শিশির চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলল,
—রানী পিসিমা, সত্যি নিভা কোথায়?
রানী পিসিমা বললেন,
—চুপ্‌চাপ্‌ বসে আছে। মনে কষ্ট হয়েছে হয় ত বেচারীর।
সুমিতা বলল,
—ঠিক আছে, চলো ইলা, অলকা, নিভার মন আজ ভালো করে দিতেই হবে!
ত্রিদিব সরল আর শিশির আলাদা বেড়াতে বেরোল।
প্রথমে ঘুরে ঘুরে রায়বাড়িটাই দেখানো হ'ল শিশিরকে।
শিশির দেখল রায়বাড়ির চেহারাটা ইচ্ছে করে সাবেকী ধাঁচের করলে কি হবে বাড়িটা নিশানাথের আমলেই তৈরী। কিছু এমন বনেদী নয়। আগে গোটাকতক টিনের চালায় এদের ভিটে ছিল। এখন সেগুলো ভেঙে গোয়াল ঘর হয়েছে।
বাড়ি বাগান পেরিয়ে গ্রামের মধ্যে দিয়ে আড়াআড়ি রাস্তা ধরে চলল ওরা। এই গ্রাম পর্যন্ত মেটালড্‌ রোড বানানোর কৃতিত্বও নিশানাথের। সরকারী মহলে লেখালিখি করে গ্রামের স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট সব কিছুর জন্যেই নিশানাথ চেষ্টা করেছিল। এখানে পাট আর চিনির কল করার জন্য জমিও কেনা আছে। বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পাকা কথা হচ্ছিল এমনি সময় তাঁর মৃত্যু হ'ল তাই এখন সব চাপাচুপি দেওয়া আছে। আর

আছে সরস্বতী নদীর বুকে চমৎকার একটি বাঁধ। যার নাম নীল বাঁধ। বাঁধটা সরকারী। কিন্তু ওখানেও নিশানাথ কলকাঠি নেড়েছেন।

কিন্তু এত করেও গ্রামের মানুষের ঠিক যাকে বলে শ্রদ্ধা সেটুকু কিন্তু জয় করতে পারেন নি।

অবশ্য সঙ্গে সরল ছিল বলে ত্রিদিবের সঙ্গে শিশির এসব ব্যাপার নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করতে পারছিল না। ত্রিদিব শিশিরকে যা বলতে চাইছিল সবটাই বলছিল সঙ্কেতে।

বেড়াতে বেড়াতে ওরা যখন সরস্বতীর খাল পর্যন্ত এসে পড়ল তখন সূর্য ডুবছে। হাতঘড়ি দেখে সরল বলল,

—সন্ধ্যে হয়ে গেল। আমি এবার বাড়ি যাই। শিশিরবাবু, আপনি কিছু মনে করবেন না।

ত্রিদিব বলল,

—যাও, ঠিক আছে।

সরলের ছায়াটা পথের বাঁকে মিলিয়ে গেলে ত্রিদিব বলল,

—জানো শিশির, সরলের ঐ একটা ব্যাপার আমার খুব ভালো লাগে। সেটা হ'ল, ও ওর বাবাকে বড় ভালোবাসে। আমি দেখেছি, ওই ভালোবাসায় ওর কোনো ফাঁকি নেই। ওর ঘরের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে দেখেছি, মাঝে মাঝে ও কি অদ্ভুত ভাবে ওর বাবার ছবির দিকে তাকিয়ে থাকে। আর রোজ সন্ধ্যেবেলা, খুব একটা কিছু জরুরী কাজে আটকে না পড়লে, ওর ধুপ দীপ দেওয়া চাই-ই।

শিশির বলল,

—সরলের কাছে একদিন ওর বাবার গল্প শুনতে হবে। আচ্ছা, সরলের মা কিম্বা ভাই-বোনেরা আছেন কি নেই সে খবর রাখো না।

ত্রিদিব বললে,

—নাঃ। সে খবর রেখে আমার কি লাভ। কাকাবাবুর ওকে জামাই করবার ইচ্ছে ছিল। বিষয় সম্পত্তির ভাগ দেবার ইচ্ছে ছিল তিনিই সব

খবর জানেন। আমার পক্ষে অত কথা ত জানা সম্ভব নয়।

কথা বলতে বলতে দু'জনে সরস্বতীর খালের ধারের নিবিড় জঙ্গলের কাছাকাছি এসে পড়েছিল। এদিকটা এখনও ঝুপ্‌সি অন্ধকার। পাশে সরস্বতীর মজাখালের কালিগোলা জল আর কষাড় কালকাসুন্দে আর ঘেঁটুর ভিড় ঠাসা বড় বড় বুনো আম বট আর অশ্বত্থের বন। পাতাভরা ডাল থেকে অন্ধকার কুয়াশামাখা কালো কাপড়ের মত দুলছে। আর বনের নানাবিধ বিচিত্র সব আওয়াজ।

শিশির বলল,

—আশ্চর্য গোঁয়ার ত এই রতন চক্রবর্তী। বিদ্যুতের শাইনটা কি দোষ করল।

ত্রিদিব হেসে বলল,

—তা আর বলতে! তবে লোকটার শুনেছি বিচিত্র ধারণা। ও নাকি দেবস্থানে ইলেকট্রিকের কানেক্‌সন্ লাগানোকে অপবিত্রতা বলে মনে করে।

শিশির একটু এগিয়ে গিয়ে কান খাড়া করে বলল,

—কোথায় যেন মন্ত্রপাঠ শোনা যাচ্ছে না?

ত্রিদিব শুক্‌নো গলায় বলল,

–কোথায় আবার, ওর আশ্রমেই হবে!

শিশির কৌতূহলী স্বরে বলল,

—চলো না দেখে আসি লোকটাকে।

ত্রিদিব বলল,

—পাগল! এত সন্ধ্যেবেলা আমি ওই সাপের আড্ডায় যাই! শিশির তুমি শহরের ছেলে। এসব অঞ্চলের ব্যাপার বুঝবে না। সাপের কথা বাদ দাও, যদি একটা কাঁকড়াবিছেই কামড়ায় তোমাকে তাহলেও কিন্তু রক্ষে থাকবে না। হাসপাতালে যেতে হবে তোমাকে। ওই গোঁয়ার লোকটার আশ্রমের কাছাকাছি কিছুতেই যাচ্ছিনে আমি। পোষা খরিশ,

গোখরো লেলিয়ে দেবে শেষকালে।

ত্রিদিব আর কোন রকম বাক্য ব্যয় না করে সোজা পিছন ফিরল। শিশিরও অগত্যা হাসতে হাসতে তার সঙ্গ নিল।

ফেরার পথে হাঁটতে হাঁটতে ত্রিদিব শিশিরকে প্রশ্ন করল,

—তারপর শিশির, বলো ত সব দেখে শুনে তোমার এখন কি মনে হচ্ছে।

শিশির বলল,

—বিশেষ কিছুই না। তবে একটা কথা বলব ?

—বলো না।

—তুমি ভাই কথাটা শুন্‌লে আমার উপর কিন্তু মর্মান্তিক চটবে।

—আহাঃ বলেই দেখ না।

শিশির হেসে বলল,

—তোমার অবস্থা খুবই শোচনীয়। সুমিতার ব্যাপারে তুমি এমনই স্পর্শকাতর হয়ে পড়েছ যে যদি আমি তোমায় বলি যে আমার সুমিতার প্রতি কিঞ্চিৎ দুর্বলতা জন্মেছে, তাহ'লে বোধহয় তুমি আমাকে-সুদ্ধ মারতে উঠবে। চাই কি এই মাঠের মাঝখানে আমার সঙ্গে একটা ডুয়েল পর্যন্ত লড়ে যেতে পারো।

ত্রিদিব খানিকটা কাষ্ঠ হাসি হাসল বটে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি রকম যে গুম্ মেরে গেল। একটাও কথা বলল না সারা পথ।

বাড়ি ফিরে এসে সদরেই দারোয়ানদের জিজ্ঞেস করে জানল মেয়েরা কাছাকাছি লাইব্রেরীতে গেছে। সেখানে কি নাকি আবার জলসা টলসা আছে।

ত্রিদিব ত একপায়ে খাড়া।

—চলো না শিশির জলসা দেখে আসি।

—দূর। তার চেয়ে চলো একটু বিশ্রাম করা যাক।

বাড়ির ভিতরে কম্পাউণ্ডে সামিয়ানা খাটানো হচ্ছিল।

মিস্ত্রিরা কাজ অর্ধেক করে রেখে গেছে। কাল শেষ হবে।

দুজনে সন্ধ্যার ছায়ায় সিঁড়ি বেয়ে উঠল। নীচে টিম্ টিম্ করে তেলের বাতি জ্বলছে। চাকর বাকররা জানাল মিনিট খানেক আগে নাকি কারেন্ট ফেল করেছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ত্রিদিব আর শিশির দুজনেই শুনতে পেল সরলের উচ্চকণ্ঠ। রানী পিসিমাও উচ্চকণ্ঠে কথা বলছিলেন। কথা বোঝা যাচ্ছিল না, কিন্তু কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল। ত্রিদিব চাপা কণ্ঠে বলল,

—আচ্ছা শিশির রায়বাড়ির দেওয়ালগুলো এত মোটা করে বানানো কেন?

শিশির ত্রিদিবের হাত চেপে ধরে পা টিপে টিপে উঠতে উঠতে বলল,

—স্ স্ স্! এসো না এগিয়ে যাই!

সিঁড়ির মুখের কাছে এসে দাঁড়িয়ে এবার ওরা স্পষ্ট শুনতে পেল রানী পিসিমা সরলের ঘরের ভিতর দাঁড়িয়ে কথা বলছেন,

—ত্রিদিব সুমিতাকে পাগলের মত ভালবাসে সরল। একথা তুমিও জানো, আমিও জানি। এরপর সুমিতার প্রতি তোমার এ ধরনের মনোভাব নিছক পাপ।

—আমার ভালবাসাই শুধু পাপ, আর ত্রিদিবের ভালোবাসা একেবারে নির্ভেজাল পুণ্য। তাই না?

রানী পিসিমার কণ্ঠ শোনা গেল,

—ও সব জানিনে। দেখো সরল, তোমাকে সুমিতার আশা ছাড়তেই হবে। অন্ততঃ আমার ভালোমন্দ ভেবেও ছাড়তে হবে। কারণ ত্রিদিবকে আমি—

রানী পিসিমা কথা বলতে বলতে বেরিয়ে আসছিলেন। হঠাৎ ত্রিদিব আর শিশিরকে সিঁড়ির মুখের কাছে দেখে হতভম্বের মত থমকে দাঁড়ালেন। একটু যতি পড়লেও তিনি আর তাঁর মুখের কথা থামাতে পারলেন না। বলে ফেললেন ত্রিদিবকে আমি ভালোবাসি।

—সেদিন রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর নিজের ঘরে এসে শিশির দুখানা চিঠি লিখল। একটি তার বন্ধু বিনোদকে আর একটি অশোককে। বিনোদের দাদা পুলিশে চাকরি করে। আর অশোক কলকাতার নানান পুরোনো বিষয় নিয়ে, ইংরিজি বই মেরে নয় যথার্থ রিসার্চ করে আর্টিকেল লেখে।

প্রথম চিঠি ঃ

প্রিয় বিনোদ,

তোমার দাদা ত শুনেছি ইনটেলিজেনস্ ব্রাঞ্চের মস্ত অফিসার। কথাটা আশাকরি সত্যি, তোমার অন্যান্য গুল্ পট্টির মত মিথ্যে নয়। অবশ্য আগেও আমার দু' চারটি অনুসন্ধিৎসা মিটিয়েছ। গত ডিসেম্বর মাসে কলকাতার রায়বাড়ির চারতলায় আগুন লেগেছিল। তোমার দাদাকে দিয়ে খোঁজ নেওয়াবে এ বিষয়ে পুলিশে ডায়েরি করা হয়েছিল কিনা? চারতলাটা ইনসিওর করা ছিল কিনা? এর পেছনে কোনো নাশকতামূলক অভিসন্ধি ছিল কিনা? এবং সিঁড়িটি কোন্ কোম্পানীর তৈরী ছিল। খবর দু'দিনের মধ্যে চাই।

ইতি শিশির

দ্বিতীয় চিঠি ঃ

প্রিয় অশোক,

একটা রিসার্চ করতে পারো? তাতে তোমার একটা প্রবন্ধ হয়ে যাবে, আর আমার একটা রহস্য কাহিনী। ১৯৩৬ সালে ···লেনে···নং বাড়িতে কোনো শিশুর····তারিখে জন্ম হয়েছিল কিনা? বার্থ রেজেষ্ট্রী অফিস থেকে তার নাম, তার বাবার নাম, মায়ের নাম বের করতে হবে। খবর চাই দু' দিনে।

ইতি শিশির

চিঠি দুটো খামে ভরে শিশির টেবল ল্যাম্পের আলো নেভাতে যাবে,

হঠাৎ দেখল দরজার পাশে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। যেন ইতস্তত করছে। ভিতরে ঢুকবে কি ঢুকবে না। ত্রিদিব ঠাহর করে দেখল। পরনে শাদা শাড়ি। সন্ধ্যেবেলা সুমিতা সাদা শাড়ি পরে ছিল। শিশির চাপা গলায় বলল—কে? সুমিতা দেবী?

এবার মেয়েটি পর্দা সরিয়ে ভেতরে এল। অনুযোগের সুরে কেমন যেন ধরা ধরা গলায় বলল,

—না আমি নিভা।

শিশির ঠাহর করে দেখল নিভাকে। টেবল ল্যাম্পের শেড্ দেওয়া আলো আঁধারিতে নিভাকে ভালো দেখা যাচ্ছিল না। শিশির শান্ত কণ্ঠে বলল,

—আপনি ঘরের ভিতরে আসুন নিভা দেবী। আমি আবছা আলোতে বুঝতে পারি নি ঠিক।

নিভা ভেতরে এসে শিশিরের লেখার টেবিলের পাশে এক ক্যাম্বিসের ইজিচেয়ার ছিল সেটাতে এলিয়ে বসল। শিশির চেয়ার টেনে টেবিলের অন্য পাশে, নিভার ঠিক মুখোমুখি বসতে বসতে লক্ষ্য করল নিভার অমন টগ্‌বগে ফুটন্ত চেহারাটি কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। শাদা শাড়িতে এক গুচ্ছ নেতিয়ে পড়া বাসী রজনীগন্ধার গুচ্ছের মত লাগছিল নিভাকে।

শিশির বলল,

—নিভা দেবী, বলুন, এখন আপনার শরীর কেমন লাগছে। নিভা একটু মরাটে হাসল। তারপর শিশিরের প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে বলল,

—শিশিরবাবু আমি কখনো ভুলতে পারি না যে আমি এই বাড়ির কেউ নই। আমাকে সে কথা ভুলতে দেওয়া হয় না। একথা আমি কাকেই বা বলি। আপনাকে বললে হয় ত আপনি খানিকটা বুঝবেন। কেন না আপনি এবাড়ির লোক নন। তবে আপনিও ত আমাকে দেখে প্রথমে

সুমিতা বলেই মনে করলেন।

শিশির হেসে বলল,

—কিন্তু বিশ্বাস করুন নিভা দেবী এবাড়ির আর দুটি সুন্দ উপসুন্দের মত আমার মোটেই সুমিতা কমপ্লেকস্ নেই। বরং তার সমবয়সী তারই মত কুমারী আর গুণবতী আর একটি মেয়েকেই আমি বেশি লক্ষ্য করেছি।

নিভা আবার মলিন হাসল।

শিশিরবাবু, আপনি যাই-ই বলুন, যতই বলুন আমি কোনোদিনই সুমিতা হতে পারব না। কারণ আমার বিত্ত নেই, দেবাব মত পরিচয় নেই। উত্তরাধিকারে পাওয়া সম্পত্তি নেই। সুতরাং তার সঙ্গে আর বৃথা তুলনা করে লাভ কি।

নিভার কথার কোন উত্তর দিতে না পেরে শিশির মাথা নীচু করে টেবিলের কাঠের ওপর আঁকি-বুঁকি কাটতে লাগল। হঠাৎ তার চেতনা এল যে এখন বাত্রি অনেক। রায়-বাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছে প্রায়। ওপর তলায় ও কোনো সাড়া শব্দই নেই। নীচের তলায় লোকজনের রাতের পাট চুকোনোর খুট্ খাট্ আওয়াজ। মাঝে মাঝে শুধু শীতের হু হু হাওয়ায় গাছের পাতার সর্ সর্ শব্দ। শিশির আড় চোখে দেখল নিভা চোখ নামিয়ে কোলের উপব দুখানি হাত রেখে বসে তাকিয়ে আছে। যেন সে শিশিরকে কিছু একটা বলবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

মাথা তুলে একসময় নিভা বলল,

—শিশিরবাবু আপনি বড় ভালো। আপনাকে সত্যি, নিজের প্রাণ থেকে বলছি আমার বড় দাদার মত মনে হয়। আর তা ছাড়া আপনি ত্রিদিবদার বন্ধু।

শিশিরের বুকের মধ্যে একটা প্রবল আতঙ্কের ঢেউ ধাক্কা খেয়ে গেল।

—আমি কাউকে কিছু বলতে পারছিনে শিশিরবাবু। বলতে বাধছে আমার। আমার আর বাঁচবার কোনো রাস্তা নেই। অথচ প্রাণের

মায়া বড় ঘোর মায়া শিশিরবাবু!

শিশির দেখল নিভা উত্তেজনায় তার সরু সরু লতানে আঙ্গুলগুলি এত জোর মুঠি করে ফেলেছে যে হাতের তেলোর রং রক্তের মত লাল হয়ে উঠেছে।

—শিশিরবাবু আমি আপনার কাছে একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি। আপনি আমার হয়ে, ত্রিদিবদাকে বলবেন কি যে তিনি যেন এই লজ্জার হাত থেকে আমাকে আর আমার সন্তানকে বাঁচান। হয় ত আত্মহত্যা করে আমি সরে যেতে পারতাম। কিন্তু একটা নিরপরাধ প্রাণ....

শিশিরের মেরুদণ্ড বেয়ে যেন শীতল একটা স্রোত নেমে আসতে লাগল। সে সেই মধ্যরাত্রে, নিভার ভয়-চকিত ফ্যাকাশে মুখখানার দিকে তাকিয়ে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারল, যে রহস্য সমাধানের লোভে এভাবে রায়বাড়িতে আসা উচিত হয় নি তার। সে যা ভেবেছিল· তার চেয়ে রায়বাড়ির আসল ঘটনাগুলো আরো অনেক, অনেক বেশি জটিল।

কম্পিত কণ্ঠে শিশির নিভাকে বলল,

—নিভা দেবী আপানি কোনো চিন্তা করবেন না। এর যা হোক একটা উপায় আমি ঠিক করবই। আপনার বিশ্রাম দরকার। আপনি এখন দয়া করে শুতে চলে যান। নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন গিয়ে। জানবেন সব দায়-দায়িত্ব আমার।

নিভা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলল,

তিন মাস হয়ে গেল প্রায়। ক্রমশ ত সবই প্রকাশ পাবে। শিশিরবাবু, তবুও, তবুও আপনি প্রতিজ্ঞা করুন। আপনার বন্ধু ছাড়া আর কাউকে এসব কথা বলতে পারবেন না।

শিশির রুদ্ধ কণ্ঠে বলল,

—করলাম।

কিন্তু শিশির কথা রাখতে পারে নি। সে ব্যাপারটা রানী পিসিমাকে পরদিনই বলেছিল।

ভোরবেলা নহবতের করুণ আর মধুর সুরঝঙ্কারে ত্রিদিবের ঘুম ভেঙ্গে গেল। আস্তে আস্তে পাশ ফিরল সে। চোখ মেলে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। আকাশে তখনও নরম বেগুনী মখমলের মত একটুখানি অন্ধকার জড়িয়ে আছে। আর সবুজ একটি মনির মত জ্বলছে শুকতারা। ত্রিদিব পবম পরিতৃপ্তি একটু যেন আলসেমি করেই চোখ বুজ্‌লো। গরম সিল্কের লেপের সুখস্পর্শের সঙ্গে প্রগাঢ় ঘুমের আরাম মিশে গিয়ে সকালের আবহাওয়াটাই সুখকর করে তুলেছে। ত্রিদিব চোখ বন্ধ করে আবার সুমিতার মুখখানিই নিজের চোখের পাতায় আঁকা দেখল।

কাল রাত্রে খাওয়া দাওয়া মিটে যাবার পর ত্রিদিব যখন নিজের ঘরে চ'লে এসে বেড্ ল্যাম্প জ্বালিয়ে একটা হালকা সিনেমা পত্রিকার পাতা উল্টোচ্ছিল তখন কি আশ্চর্য, তখন সুমিতা তার ঘরে এসেছিল।

ত্রিদিবের খুঁটিনাটি সব মনে পড়ল। সুমিতার হাল্কা মেঘ রঙের শোয়ার পোষাকের ওপর জড়ানো ভারি সাটিনের হাউসকোট। তার সরু কটি-দেশ আর একটু ভারাবনত বুকেব কোমল সুগঠন....সব...।

সুমিতা এসে ত্রিদিবের পায়ের কাছে বসেছিল।

ত্রিদিব ব্যস্ত হয়ে লেপ ফেলে উঠে বসতে চেয়েছিল। সুমিতা লেপের ওপর থেকে তার পায়ে হাত রেখে বলেছিল,

—না না তুমি শোও না ত্রিদিবদা। আমি তোমার সঙ্গে একটু গল্প করি। গল্প আর হয় নি। তুজনে অন্যদিকে চেয়ে মুখোমুখি বসেছিল।

হঠাৎ সুমিতা বলেছিল,

—আচ্ছা ত্রিদিবদা বলো ত কালকে কি ?

—কাল, সরস্বতী পুজো।

—না, শুধু সরস্বতী পুজোই নয়, তোমার জন্মদিন।

সত্যি ? আরে আমার ত খেয়ালই ছিল না।

সুমিতা খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে বসে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠেছিল,

—আমি জানতাম!

ত্রিদিব মাঝে মাঝে মনে মনে অনুভব করত হয় ত সুমিতা তাকেই ভালোবাসে। কখনো বা সরলের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা দেখে মনে হ'ত সে ভুল করেছে। সুমিতার মন সরলের দিকেই। ত্রিদিবের প্রতি নিজের মনোভাব এ ভাবে এর আগে আর কোনোদিন প্রকাশ করে নি সুমিতা।

সুমিতা নরম গলায় বলেছিল,

—আচ্ছা ত্রিদিবদা বলো, কালকে তোমার কি উপহার চাই?

—ত্রিদিব হেসে বলেছিল,

—আর কিইবা চাইব? চাওয়ার অতিরিক্তই ত পেয়ে গেছি!

সুমিতা বলেছিল,

—আহা!

তারপর হঠাৎ উৎসাহ ভরা কণ্ঠে সুমিতা বলেছিল,

—ত্রিদিবদা, কাল একটা জায়গায় বেড়াতে গেলে•কিন্তু বেশ হয়। যাবে?

ত্রিদিব প্রশ্ন করেছিল,

—কোথায়?

—নীল বাঁধে!

ত্রিদিবের সঙ্গে চোখে চোখ মিলতেই হেসে উঠল দুজনেই।

ত্রিদিবের মনে পড়ে গেল এই নীল বাঁধে বেড়াতে যাওয়া নিয়ে এর আগের বার সে আর সুমিতা খুব ঝগড়া করেছিল। সেবার ত্রিদিবের আগ্রহই ছিল বেশি। নীল বাঁধ জায়গাটি বেড়ানর পক্ষে এত সুন্দর। কিন্তু সেবার কিছুতেই সুমিতাকে রাজি করানো যায় নি। ত্রিদিব যত নীল বাঁধের বর্ণনা দেয় সুমিতা ততই বেঁকে বসে। এবার যে হঠাৎ কি করে হাওয়া ফিরল। সুমিতা উঠে দাঁড়িয়ে ষড়যন্ত্রীর মত মুখ করে বলেছিল,

— তাহলে মনে থাকে যেন। সন্ধ্যে ছটায় তুমি আর আমি নীল বাঁধে বেড়াতে যাচ্ছি। কিন্তু কাউকে কিছু জানানো হবে না। তুমি বাড়ি থেকে আলাদা বেরোবে। আমিও। শিশিরবাবুকেও কিছু বলতে পারবে না। তাহলে মনে রইল ত, সন্ধ্যে ছটায়, নীল বাঁধে ···

তখনই রানী পিসিমা ঢুকলেন ত্রিদিবের ঘরে। সুমিতাকে দেখে বললেন,

—নীল বাঁধে কিরে? বেড়াতে যাবি?

সুমিতা বলল,

—না, না, রানী পিসিমা।

মাথা ঝাঁকিয়ে সুমিতা রানী পিসিমার পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল।

রানী পিসিমা বললেন,

—আর পারিনে বাবা এদের নিয়ে। এত রাত হয়ে গেছে তবু শুতে যাবার নাম নেই।

রানী পিসিমা ভিতরে এসে ত্রিদিবের সামনে একটা চেয়ারে বসলেন।

ত্রিদিব এবারে উঠে লেপ সরিয়ে পা ঝুলিয়ে বসল।

রানী পিসিমা বললেন,

—আমি আজ আর পারলাম না ত্রিদিব। সরলকে সব বলে ফেললাম।

ত্রিদিব গাঢ় কণ্ঠে বলল,

—রানী পিসিমা, আমি সব শুনেছি। আজ সন্ধ্যে বেলা যখন সিঁড়ি দিয়ে আমি আর শিশির উঠছিলাম তখন····।

রানী পিসিমা ত্রিদিবের দিকে তাকিয়ে বললেন,

—শুনেছিলে ত্রিদিব!

—সত্যি রানী পিসিমা, মাঝে মাঝে, আমার কি ইচ্ছে করে জানেন? ইচ্ছে করে সরলকে বিষয় সম্পত্তি সব লেখাপড়া করে দিয়ে আপনাকে আর সুমিতাকে নিয়ে কোথাও চলে যাই। কিন্তু তাত হবার নয়। সুমিতাই বা তার বাবার বিষয় সম্পত্তি ছেড়ে কেন যাবে?

রানী পিসিমা বললেন,

—ত্রিদিব আমিও ঠিক তোমারই মত, আমি অসম্ভবের স্বপ্ন দেখি। মনে হয় যদি তোমাকে আর সুমিতাকে নিয়ে আমার চন্দননগরের বাড়িতে চলে যেতে পারতাম। আমার বড় ভয় কবে। বড় ভয় করে ত্রিদিব।

—কাকে, কাকে বানী পিসিমা ?

ত্রিদিবের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ রানী পিসিমা বলে উঠেছিলেন,

—ত্রিদিব, তোমাকেই।

সরস্বতী পূজো, আর তাব জন্মদিনের এই মিষ্টি ভোরবেলাটিতে ঘুমের আল্‌সেমি কাটাতে কাটাতে ত্রিদিবের চিন্তায় হঠাৎ একটা বেসুরো তার বাজ্‌লো রানী পিসিমা হঠাৎ ঐ কথাটিই বা বললেন কেন ?

আস্তে আস্তে ঘুমেব জড়তা কাটিয়ে বিছানা থেকে নেমে নীচে বাগানের ধারে এসে দাঁড়াল ত্রিদিব। দেখল সুমিতা দলছাড়া হয়ে একা একা মাঠের অযত্নে বেড়ে ওঠা সবুজ ঘাসেব মধ্যে দাঁড়িয়ে নীচু হয়ে শিউলি ফুল কুড়োচ্ছে। ফিকে বেগুন ফুল রঙের শাড়ির আঁচলে শিউলি গুলো চমৎকার মানিয়েছে। ত্রিদিব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। সুমিতাও ত্রিদিবকে দেখে শিউলি তলা থেকে উঠে এসে ত্রিদিবের পাশ দিয়ে যেতে যেতে চাপা গলায় বলে গেল, মনে আছে ত ?

ত্রিদিব কি যেন উত্তর দিতে যাচ্ছিল।

অলকা আর ইলা গায়ে রাজ্যের গরম জামা আর শাল চাপিয়ে রানী পিসিমার পাসে বসে মণ্ডপে নৈবেদ্য সাজাচ্ছিল। ওরা ত্রিদিবকে ডাক দিল। —ত্রিদিববাবু ওখানে একা দাঁড়িয়ে কি করছেন এ দিকে আসুন না।

ত্রিদিব হাসতে হাসতে এগিয়ে গিয়ে দেখল একপাশে দুটি মোড়ায় বসে সরল আর শিশির চা খাচ্ছে।

সরল আর শিশিরকে একসঙ্গে দেখেই ত্রিদিবের মুখ একেবারে মেঘলা

হয়ে গেল।

সে অন্যদিকে একটু দূরে একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসল। এবং গরম চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে চুমুক দিয়ে একেবারে স্থিরই করে ফেলল যে আজ সারাদিন সে শিশির আর সরলের সঙ্গে কথা বলবে না।

রানী পিসিমা কি একটা কাজে উঠে গেলেন। তখন ত্রিদিব অলকা ইলা আর সুমিতার সঙ্গে গল্প শুরু করেছে। কিন্তু তার কান পড়েছিল শিশির আর সরলের কথোপকথনে। সরল শিশিরকে নীচু গলায় বলল।

—একবার আজ কলকাতায় যাবেন ?

শিশির বলল,

—যাবো,

—সুমিতার জন্য কিছু একটা উপহার কিনতে চাই।

শিশির হাসল,

—খেয়ে দেয়ে বেরোবো। দেউলচাঁপায় ফিরব বিকেলে। বিকেল সাড়ে ছটায় সুমিতাকে বলে রাখব আমার ঘরে আসতে। তারপর হঠাৎ চমকে দেবো। জানেন শিশিরবাবু সুমিতা সারপ্রাইজ্ জিনিষটা খুব পছন্দ করে।

শিশির সরলের দিকে চেয়ে হাসল।

ত্রিদিবের চোখের সামনে এক মুহূর্তে সারা সকালটা কালো—ঘোর হয়ে এ'ল। সে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল নিজের ঘরে চলে যাবে বলে। হঠাৎ তার খেয়াল হ'ল সুমিতা অলকা ইলা সবাই আছে, কিন্তু নিভা ধারে কাছে কোথাও নেই। ত্রিদিব চকিত স্বরে বলল,

—রানী পিসিমা কোথায় গেলেন, নিভাকে কেন দেখতে পাচ্ছিনে।

শিশির আর সরল কথোপকথন থামিয়ে ত্রিদিবের দিকে তাকাল।

অলকা বলল,

—নিভা শুয়ে আছে।

ত্রিদিব অপ্রস্তুতের মত বলল,

—বাঃ। চমৎকার ত! সরস্বতী পুজোর দিন সকালবেলা—শুয়ে!

নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় আবার বসল ত্রিদিব। তারপর গা এলিয়ে দিল। ইতিমধ্যে নতুন করে বিছানা করে সুজনী ঢাকা দিয়ে গেছে লোকজনেরা। ঘরটি সকালের রদ্দুরে ঝক্‌মকে। ফুলের গন্ধে দেরাজের উপরটা ম' ম' করছে। কলকাতা থেকে প্রচুর লাল গোলাপ এসেছে। ত্রিদিবের সমস্ত মন কেমন যেন একধরনের অবসাদে ভরে গিয়েছে। সকালের সেই আনন্দ আর নেই। সব ম্লান হয়ে গিয়েছে। সরলের মধ্যে সে কেমন অদ্ভুত একধরনের মালিন্য দেখতে পায়। কিন্তু সে কথা কাউকে বলার নয়। কেউ বুঝতেই চাইবে না। আশ্চর্য এই সরলেরও কত দুঃসাহস! এখনও ও সুমিতার দিকে হাত বাড়াতে চায়।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ত্রিদিব ভাবল, যাক্ তবু সুমিতা আর রানী পিসিমা অন্ততঃ তার সান্ত্বনাস্থল। এমন কি তার নিজের বন্ধু শিশিরও যখন তাকে এইভাবে পরিত্যাগ করছে তখন আর বাইরের লোকের ওপর নির্ভর করবে না ত্রিদিব।

ত্রিদিব আবার একটা পত্রিকা নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। সে ঠিক করেই ফেলল যে আজ আর সে নীচে নামবেই না। কারো সঙ্গে বাক্যালাপও করবে না।

কিছুক্ষণ বাদে পত্রিকাটাও ফেলে দিল ত্রিদিব। তার পর বিছানার মধ্যে ছট্‌ফট্ করতে লাগল। অদ্ভুত একটা অস্থিরতায় পেয়েছে ত্রিদিবকে। অপেক্ষা আর সয় না। একবার সে ভাবল কখন সুমিতার সঙ্গে সেই সন্ধ্যা ছটায় দেখা হবে? তার আগেই যদি সুমিতাকে নিজের ঘরে ডাকা যেত। যদি সুমিতাকে নিজের সব অশান্তি আর অস্থিরতার কথা বলা যেত। অনেকক্ষণ নিজের মনের মধ্যে তোলাপড়া করার পর ত্রিদিব উঠে সুমিতার ঘরে এল। সুমিতার ঘরে কেউ নেই। খানিকক্ষণ একটা চেয়ারে বসে অপেক্ষা করল ত্রিদিব। হঠাৎ ত্রিদিবের চোখে পড়ল সুমিতার বিছানার ওপর একটা মুখ বন্ধ করা নীল খাম পড়ে আছে।

ত্রিদিব তাড়াতাড়ি খামটা তুলে নিল। নিয়ে প্রায় দৌড়ে নিজের ঘরে চলে এল। সন্তর্পণে জল দিয়ে খামটা খুলে দেখে ভিতরে সরলের লেখা একটা চিঠি।

স্নুমি,

সন্ধ্যে সাতটায় আমার ঘরের পিছনের দরজা দিয়ে আসবে। ভয় নেই আমি একলা থাকব না। শিশিরবাবুও থাকবেন। তোমাকে আমি দারুণ অবাক করে দিতে চাই।

—সরলদা

ত্রিদিব বেশ কয়েকবার পড়ল চিঠিটা। তারপর কি যেন ভাবল খানিকক্ষণ. ফেব খামে ভরে আবার সুমিতার বিছানায় রেখে এল।

দাঁতে দাঁত চেপে ত্রিদিব নিজের মনেই বলল,—দেখা যাক্ কার দিকে বেশি টান সুমিতার। আজই পরীক্ষা।

অস্থির চিত্তে ওপরের চওড়া বারান্দাটায় পায়চারি করতে করতে ত্রিদিব বারান্দাটা যেখানে ছাদের সঙ্গে মিশে গেছে সেখানে ঝুলন্ত বাগানের মত লতায় পাতায় ঢাকা ঘরের মত একটি জায়গায় সে শিশির আর নিভার কথোপকথন শুনতে পেল। মার্শাল নীল্, কেগেন ভোলিয়া আর মাধবী লতায় জড়াজড়ি বিতানে লিলির সার সার টব বসানো। কয়েকটা লোহার সেকেলে ধরনের কেদারা সাজানো। ভিতরে বসলে বাইরে থেকে আর সহজে কাউকে দেখা যায় না। ত্রিদিব কান খাড়া করে শুনছিল। কারণ তার নামটাই বার বার উচ্চারিত হচ্ছিল সেখানে। নিভাই কথা বলছিল।

—জলা পাহাড়ের সেই সন্ধ্যেটার কথা ভোলবার নয় শিশিরদা।

ত্রিদিব সচকিত হল। শিশির আবার কবে থেকে নিভার দাদা হ'ল? না কি ইতিমধ্যে সুমিতারও হয়েছে। ত্রিদিব পাশের বারান্দার রেলিঙ্ ধরে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল।

—শিশিরদা জানেন দার্জিলিঙে সুমিতাদের চমৎকার একটি বাড়ি

আছে। সেদিন বেশ শীত পড়েছিল। অবশ্য দার্জিলিঙের বাড়িতে বিলিতি কেতার ফায়ার প্লেস্ ছিল। সুমিতা ইলেকট্রিক হিটারের চেয়ে ফায়ার প্লেসে কাঠের আগুন করা পছন্দ করত। ফায়ার প্লেসে কাঠ ঠেলে দিয়ে আমরা সবাই রানী পিসিমাকে ঘিরে ড্রইংরুমে বসেছিলাম। জানালার কাচের শার্সিগুলো সব বন্ধ। বাইরে সিপসিপে বৃষ্টির আওয়াজ। ঠাণ্ডায় তবু হাত পা প্রায় কোলের মধ্যে গুটিয়ে আসতে চাচ্ছিল। রানী পিসিমা আমাদের জলাপাহাড়ের ভূতের গল্প বলছিলেন।

শিশির নিভাকে থামিয়ে থামিয়ে প্রশ্ন করছিল।

—কে কে ছিল সেদিন তোমাদের গল্পের আসরে ?

—আমরা সবাই। আমি, রানী পিসিমা, সুমিতা, সরলদা আর ত্রিদিবদা। রানী পিসিমা বলছিলেন জলাপাহাড়ে নাকি একটা অদ্ভুত ছায়া দেখা যায়। যারা সেই ছায়াটা দেখেছে তাদের অনেকেই আর ফিরে আসে নি। ছায়ার পিছনে পিছনে ধাওয়া করে খাদে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কিম্বা কেউ ঠেলে ফেলে দিয়েছে। যারা ফিরে আসতে পেরেছে, তারা বলে, কে নাকি অস্ফুট স্বরে কানের কাছে বলে,—যা না, লাফিয়ে পড়্ না, ...লাফিয়ে পড়্ না।

হঠাৎ সরলদা বললেন,—আমার এখুনি জলাপাহাড়ের সেই ভূতকে দেখে আসতে ইচ্ছে করছে। সুমিতা বলল—'আমারও'। ব্যস্ ওরা দুজনে সঙ্গে সঙ্গে স্থির করে ফেলল যে জলাপাহাড়ে তক্ষুনি সেই মুহূর্তে যেতে হবে। সুমিতাকে ত জানেন, যে কোন জিদের ব্যাপারে ও সর্বদাই একপায়ে খাড়া। রানী পিসিমা ওদের দুজনকে কত বোঝালেন। 'বাইরে বৃষ্টি পড়ছে'। 'এখন বেরিও না', 'পরে গেলেই ত চলবে'। সে কে শোনে কার কথা। রানী পিসিমা বললেন, 'বেশ যাবি যা, কিন্তু অন্ততঃ নিভাকে আর ত্রিদিবকেও সঙ্গে নিয়ে যা।' আমার শরীর ভালো ছিল না। ঐ রকম ঠাণ্ডায় আর বৃষ্টিতে বেরোব কি করে। আর ত্রিদিবদা কি রকম অভিমানী জানেন ত। যেহেতু সুমিতা সরলদার সঙ্গে

বেরোতে চেয়েছে সেহেতু ও আর কিছুতে যেতে চাইল না। সুতরাং সরলদা আর সুমিতা রীতিমত বর্ষাতি এঁটে রওনা হ'ল। আসর ভেঙে গেল। আমার শরীরটা ভালো ছিল না। হিল্ ডায়েরিয়ায় ভুগছিলাম। একেবারে রক্তশূন্য অবস্থা। আমি ওপরে নিজের ঘরে শুতে গেলাম। ত্রিদিবদা আর রানী পিসিমা বসে রইলেন।

নিভার গল্প বলার সুন্দর ভঙ্গিতে ত্রিদিবের নিজের ওপর নিজেরই রাগ হতে লাগল। সে স্পষ্ট বুঝতে পারল যে গল্প বলাটা তার তেমন ধাতে আসে না। নিভা কি সুন্দর বলছে। জলাপাহাড়ের ঘটনাগুলো তার স্মৃতিতেই ছিল না। এখন নিভার গল্পে প্রাণ পেয়ে যেন বেঁচে উঠছে।

—তারপর শিশিরদা, বাকিটা যা শুনেছি তার ওপর নির্ভর করে বল্‌ছি। সুমিতা আর সরলদা বেরিয়ে যাবার পর ত্রিদিবদা আর রানী পিসিমার চিন্তা বাড়তে থাকে। ত্রিদিবদা বার বার রানী পিসিমাকে বলে, কুয়াশার মধ্যে ওরা দুজনে যে কোথায় গেল। বিশেষ করে বৃষ্টি হয়ে চারিদিক যেরকম পিছল হয়ে আছে।

রানী পিসিমারও ক্রমশঃ ভয় বাড়তে থাকে। তিনি তখন ত্রিদিবদাকে বার বার উঠে গিয়ে ওদের পেছু পেছু যেতে বলেন। ত্রিদিবদা কেমন অভিমানী আর জেদি ছেলে আপনি জানেন ত। ও কিছুতেই যাবে না। যেহেতু সরলদা আর সুমিতা ওকে ডাকে নি। শেষে রানী পিসিমা নিজেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। তখন ত্রিদিবদাও দোমনা হয়ে বেরিয়ে পড়ে। রানী পিসিমার ত খুব একটা পথে ঘাটে বেড়ানো অভ্যেস ছিল না। তাই পথ হারিয়ে ফেলুন বা আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকুন, যে কারণেই হোক রানী পিসিমার আগেই কিন্তু ত্রিদিবদা সুমিতাদের নাগাল ধরে ফেলে। ত্রিদিবদা জানত সুমিতা সাধারণত কোথায় বেড়াতে যায়। একটা খাদের ধারে। সুমিতার নাকি ওখানকার গাছ-পালার শোভা খুব ভালো লাগত। ত্রিদিবদা সেখানে ঘোর কুয়াশার মধ্যে সুমিতাকে দেখতে পায়। আর শুধু সুমিতাকেই দেখতে পায় নি

ত্রিদিবদা, সে আরও দেখেছিল যে সুমিতা পা ফস্‌কে খাদের মধ্যে পড়ে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি ওর আঁচলের কিম্বা কোটের কোণা, একটা কিছু ধরে ফেলে সুমিতাকে ধরে ফেলেছিল ত্রিদিবদা। তখন রানী পিসিমাও সেখানে পৌঁছে যায়। তখন তিনিও হাত লাগান।

শিশির বাধা দিয়ে প্রশ্ন করেছিল,

—তখন সরল কোথায় ছিল ?

—সরলদা প্যাটিস্‌ কিনতে গিয়েছিল। যখন ওরা বেড়াতে যায় তখন খাদের ধারে বিশেষ কুয়াশা ছিল না। সুমিতা বলেছিল, 'সরলদা তুমি প্যাটিস্‌ কিনতে যাও, আমি বরং একা একা বসে বসে ভূত টুত দেখবার চেষ্টা করি।'

শিশির প্রশ্ন কবেছিল—

সরল প্যাটিস্‌ এনেছিল ?

—হ্যাঁ খানিকক্ষণ বাদেই ত ফিরলেন সরলদা!

—আচ্ছা নিভা, দোকান কতদূরে ?

বেশ দূরে। একদিন, মনে আছে, জানেন শিশিরদা আমিও ওই খাদের ধারে সুমিতা ও রানী পিসিমাকে বসিয়ে রেখে, তাড়াহুড়ো করে প্যাটিস্‌ আনতে গিয়ে পা কেটে ফেলেছিলাম। এই যে দেখুন না শিশিরদা। কতটা কেটে গিয়েছিল। কিরকম লম্বা সেলাই-এর দাগ।

শিশিরের কণ্ঠে অস্ফুট আর্তনাদ শোনা গেল।

—ইস্‌স্‌, সত্যিই ত অনেকখানি কেটে গিয়েছিল।

ত্রিদিব ওদের দুজনের কথোপকথন আরো একটু ভালো করে শুনবে বলে এগিয়ে গেল। জলাপাহাড়ের দুর্ঘটনাটা পাক খেয়ে খেয়ে উঠল ত্রিদিবের মনের মধ্যে। আজ নিভার মুখে গল্পটা শুনে তার মনের ভিতর একটা নতুন সাড়া এল। ত্রিদিব পরিষ্কার বুঝতে পারল জলাপাহাড়ের কাহিনীটা আবার নতুন ভাবে ভেবে দেখতে হবে ত্রিদিবকে।

বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে থেকে ত্রিদিব শিশির আর নিভার কথোপকথনের

কোনো সাড়া শব্দ না পেয়ে আস্তে আস্তে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে নীচের উৎসবের দিকে তাকিয়ে থেকে বহুক্ষণ ত্রিদিব পুরো ঘটনাটাকে মনের মধ্যে ওলট্ পালট্ করতে লাগল।

সত্যিই ত কথাটা সে ত আগে ভেবে দেখে নি। আচ্ছা সরল যদি ধারে কাছে নাই-ই ছিল তবে সুমিতাকে খাদের দিকে ঠেলে দিয়েছিল কে? আজ বিদ্যুৎচমকের মত হঠাৎ ত্রিদিবের মনে হ'ল, আচ্ছা নিভা নয় ত! নিভা এসে সুমিতাকে ঠেলে ফেলে দেয় নি ত? কিন্তু নিভা ত ওপরে শুতে গিয়েছিল। কিন্তু নিভা বলেছিল যে সে ওপরে শুতে গিয়েছিল তার ঘরে। কিন্তু সে'ত নিভাই বলেছে। কেউ ত তাকে শুতে যেতে দেখে নি। কেউ ত তাকে শুয়ে থাকতে দেখে নি।

নিশ্চয়ই নিভাই সুমিতাকে ফেলে দিয়েছিল। এই নতুন অনুমানের কথাটা সুযোগ পেলেই বলে দিতে হবে শিশিরকে। কিন্তু শিশির যদি পাল্টা প্রশ্ন করে? তাহলে ত্রিদিব কি উত্তর দেবে? ত্রিদিব চিন্তা করতে লাগল। যদি শিশির বলে যে সুমিতাকে ফেলে দেওয়ার ব্যাপারে নিভার স্বার্থটা কি? তাহলে ত্রিদিব কি যুক্তি দেখাবে। রানী পিসিমা, নিভা, সরল আর ত্রিদিবের মধ্যে সরল ছিল না। রানী পিসিমা ছিলেন দূরে, ত্রিদিব ছিল রক্ষাকর্তা আর নিভা? নিভার তৎপরতার কথা ত কেউ জানে না। সেদিন খাওয়া দাওয়ার পর সরল আর শিশির ট্রেনে করে কলকাতায় চলে গেল। যাবার আগে শিশির ত্রিদিবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। কিন্তু ত্রিদিব ইচ্ছে করেই শিশিরের সঙ্গে কোনো রকম বাক্যালাপ করল না। ঘুমের ভান করে পড়ে রইল।

শিশির আর সরল চলে যাবার পর ত্রিদিব উঠে নীচের পূজা মণ্ডপে, বাগানে উদ্দেশ্যহীন ভাবে খানিকটা ঘুরে বেড়াল। তারপর এল বড় হল ঘরে। সেখানে সুমিতা, অলকা আর ইলা তাস খেলছিল। নীভার শরীর ভাল নেই। সে নিজের ঘরে চুপচাপ শুয়েছিল। ত্রিদিব জানলা

দিয়ে নিভার ঘরে উঁকি মেরে দেখল নিভা রোদে পা মেলে গায়ে লাল শাল দিয়ে শুয়ে শুয়ে একখানা এ্যালবাম্ দেখছে। ত্রিদিব রানী পিসিমার ঘরে গিয়ে একটা সাজা পান খেয়ে নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়ল।
ত্রিদিবের মনের মধ্যে একটা অস্থিরতা খেলে বেড়াচ্ছিল। সেদিন বিকেলে এই সে প্রথম সুমিতার ডাকে, একা সুমিতার সঙ্গে নীল বাঁধে দেখা করতে যাচ্ছে সে। কতদিনের চাপা বেদনা, বাসনা, কতদিনের আশা নিরাশার দ্বন্দ্বের আজ অবসান হবে।
নীল বাঁধে দেখা হ'লে সুমিতাকে কি বলবে ত্রিদিব, কি বললে ভালো শোনাবে, সুমিতার মনে দাগ কাটতে পারবে—এমন কি-ত্রিদিব এরূপ ছেলেমানুষী ভাবনাও ভাবছিল, যে সে কি পোষাক পরে যাবে? সুমিতা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে ধুতি পাঞ্জাবি আর শালের সাজ। তার সঙ্গে কোথাও নেমতন্ন থাকলেই ত্রিদিব আর সরলকে সে ধুতি পাঞ্জাবি পরাবেই। আদুরে আদুরে গলায় বলবে,—না তা কেন? তোমরা স্যুট কোট হাঁকাবে আর আমি বেচারী বুঝি ওই মান্ধাতার আমলের শাড়ি পরে যাবো। আমিও তাহলে মেম সাহেবদের মত পোষাক পরব। নিয়ে যেতে পারবে আমাকে তোমরা সঙ্গে করে?
সুমিতার কথা বলার ভঙ্গি মনে করে ত্রিদিব একা একাই হাসল। এই সব নানারকম অর্থহীন, মূল্যহীন মধুর সব মুহূর্তের কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে ত্রিদিবের চোখ জড়িয়ে এসেছে, তা সে নিজেই জানে না।
ঘুম ভাঙল রানী পিসিমার ডাকে। ডাক নয় প্রায় আর্ত চিৎকার। ত্রিদিব ওঠো বাবা, ত্রিদিব ও ত্রিদিব!
ধড়্ মড়্ করে উঠে বসল ত্রিদিব। চোখ মেলে রানী পিসিমাকে বিহ্বলের মত প্রশ্ন করল,
—কি, কি হয়েছে রানী পিসিমা,
রানী পিসিমা ফ্যাকাশে মুখে বললেন,
—নিভা, নিভা আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছে। যাবার আগে একটা

চিঠিও রেখে গিয়েছে।

—কোথায় চলে গেছে নিভা ? কোথায় ? কেন ?

—তা' ত জানি না। সে লিখে গিয়েছে যেখানে দুচোখ যায়। ঐখানেই ত আমার ভয় ত্রিদিব! ও যদি আত্মহত্যা করে ?

ত্রিদিব চমকে উঠে বলল,

—সে কি ? আত্মহত্যা করবে কেন ? কই চিঠিটা দেখি !

রানী পিসিমা সিঁটিয়ে উঠলেন। যেন ভুত দেখছেন।

—না, না, সে চিঠি আমি কিছুতেই দেখাতে পারব না।

ত্রিদিব বলল,

কেন দেখাতে পারবেন না। কি এমন কথা লেখা আছে তাতে। ববং চিঠিটা পড়লে হয়ত সে কোথায় গিয়েছে তা জানা যাবে।

ত্রিদিব আবার হাত বাড়াল।

রানী পিসিমা নিজেকে আরও গুটিয়ে নিয়ে বললেন,

—না ত্রিদিব সে চিঠি আমি কাউকে কোনোদিন দেখাতে পারব না বাবা। সে চিঠি আমার কাছেই আছে। আমি লুকিয়ে রেখেছি। তেমন বিপদ বুঝলে বরং পুড়িয়ে ফেলব। তবু কাউকে দেখাতে পারব না।

ত্রিদিব ততক্ষণে উঠে পড়ে গেঞ্জির ওপর একটা শার্ট চাপিয়ে চটিতে পা গলাচ্ছে। একটু বিরক্ত হয়ে সে বলল,

—এ ধরনের সেন্টিমেণ্টের কোনো মানেই হয় না রানী পিসিমা। যাক্‌গে আপনি যা ভালো বুঝবেন তাই-ই করবেন।

ত্রিদিব চকিতে একবার হাতঘড়িটা দেখে নিল। হাতঘড়িতে তখন সাড়ে পাঁচটা। এখনও যদি রওনা হয় সময় মত নীল বাঁধে পৌঁছে যেতে পারে। সেখানে সুমিতার সঙ্গে দেখা হওয়াটা তার পক্ষে একান্তই জরুরী। যদি সময় মত সুমিতার সঙ্গে দেখা না হয়। তাহলে হয় ত অভিমান করে সুমিতা ফিরে এসে সন্ধ্যেবেলা সরলের ঘরে সরলের সঙ্গে দেখা করবে। হয় ত জিদের বশে সরলকেই একটা অসম্ভব প্রতিশ্রুতি দিয়ে

বসবে। কিন্তু রানী পিসিমার মুখের দিকে আর নিজের মনের দিকে তাকিয়ে সে বুঝতে পারল মনুষ্যত্বের দিকে তাকিয়ে নিভার খোঁজ করতে বেরোনোই উচিত। পরে না হয় অবুঝ সুমিতাকে সমস্ত ঘটনাটা বুঝিয়ে দেওয়া যাবে।

রানী পিসিমা বললেন,

—নিভা বোধ হয় ষ্টেশনের দিকেই গেছে। আমি ওর ঘরে গিয়ে দেখেছি, ওর সুটকেশ্‌টা নেই।

—বেশ, তাহলে আমি ষ্টেশনের দিকেই যাই।

রানী পিসিমা বললেন,

---গেলে ভালোই ত হয় ত্রিদিব!

ত্রিদিব শেষবারের মত জিজ্ঞেস করে বসল,

—আচ্ছা রানী পিসিমা সুমিতা কোথায় ?

—সুমিতা ত অলকা আর ইলার সঙ্গে বেরিয়ে গেছে।

—ওরা জানে না নিভা চলে গেছে ?

--না। যখন সুমিতারা বেরিয়ে যায়, আমি তখন জানিই না যে নিভা বাড়ি থেকে চলে গেছে।

ত্রিদিব বুঝতে পারল সুমিতা অলকা আর ইলার সঙ্গে বেরিয়েছে বাড়ির লোকেদের চোখে ধুলো দেবার জন্য। ওদের অন্য কোথাও চালান করে দিয়ে সুমিতা ঠিক একা একা নীল বাঁধে যাবে। ত্রিদিব হাতঘড়িটা দেখে নিল একবার। নিজের ওপর নিজেরই করুণা হ'ল তার। জীবনে প্রত্যেকটা শুভ মুহূর্তেই যেন তার হাতের কাছে এসে ফস্‌কে যেতে চায়। সুমিতা একা একা নীল বাঁধে গিয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করে করে ফিরে আসবে যখন, তখন সুমিতার মনে আর ত্রিদিবের জন্যে সামান্যতম প্রেমও কি অবশিষ্ট থাকবে?

ত্রিদিব মনমরা হয়ে বেরিয়ে পড়ল।

সরল আর শিশির কলকাতা থেকে দেউলচাঁপায় এসে পৌঁছোল সন্ধ্যে সাড়ে ছ টায়। ষ্টেশন থেকে একটা প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া করে নিল তুজনে।

সরল সারা সময়টা শুধু সুমিতার কথা বলতে বলতে গেছে আর এসেছে। আসলে সরলের কলকাতা যাবার উদ্দেশ্যটাই ছিল খুব ছেলেমানুষীতে ভরা। সে সুমিতার জন্যে একটা উপহার কিনতে কলকাতায় গিয়েছিল। আর সেই ফাঁকে তার বাবার ছবিটা নতুন করে ভালো কাচে আর ফ্রেমে বাঁধিয়ে আনতে।

চমৎকার একটা চুনী-পান্নার কাজ করা নেক্‌লেশ্‌ কিনেছে সে। সরল বলছিল নেকলেশটি নাকি তার নিজের রোজগারের পয়সা জমিয়ে। একটা যেমন তেমন হালকা জিনিষ নয় নেকলেশটা। খুব ভারি আর গলাজোড়া, চওড়া। শিশির বলেছিল আর একটু হাল্কা আর ছিম্‌ছাম্‌ নেকলেশ বাছাই করলে হয় ত সুমিতার আরও মনে ধরবে। সরল বলে-ছিল চিরকালের সম্পর্ক গড়তে গেলে বাঁধার শেকলটাও ভারি হওয়া দরকার।

শিশির সরলের বক্‌বকানি আর উচ্ছ্বাসের কথাগুলো মাঝে মাঝে শুন-ছিল, আবার মাঝে মাঝে মন দিচ্ছিল অন্য চিন্তায়।

নিভা বারন করা সত্ত্বেও শিশির রানী পিসিমাকে নিভার সঙ্কটের কথা না বলে পারে নি।

রানী পিসিমা নিরূপায় মুখে চুপচাপ সব শুনেছিলেন। তারপর তাঁর চোখ তুটি সজল হয়ে উঠেছিল।

তিনি বলেছিলেন,

—ত্রিদিবের কোনো দোষ নেই বাবা। সব দোষ ওর ভাগ্যের আর ওর পরিবেশের। ওর জীবনের বঞ্চনা ওকে যেমন স্নেহের কাঙাল করেছে, তেমনি ওকে করেছে আবেগপ্রবণ আর প্রতিহিংসাপরায়ণ। আমি সব জানি, বুঝি। আমি যে ওদের মায়ের মত। পেটে ধরি নি তাই মা

বলতে পারিনে। তবে এখন আর সত্যি এড়িয়ে যেতে পারছিনে বাবা। আমার মনেও ভয় আসছে।

শিশির বুঝতে পেবেছিল সদা সচেতন বানী পিসিমা এই মুহূর্তে এমন দুর্বল হয়ে পড়েছেন যে এখন তাঁকে দু একটি প্রশ্ন করে অনেক কথা বের কবে নিতে পাবা যায়। সে প্রশ্ন কবেছিল,

—আচ্ছা রানী পিসিমা, একটা কথা বলব আপনাকে?

—বলো।

—আপনাব যা ধাবনা ঠিক সেই ধাবনাব কথাটিই বলতে হবে।

বানী পিসিমা তাঁব শান্ত চোখ দুটি শিশিবেব মুখেব দিকে ফেরালেন।

—আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস কবেন সুমিতাব যে তিনবার জীবন বিপন্ন হয়েছিল. সেই তিনটি অস্বাভাবিক ঘটনা নিছক দুর্ঘটনা মাত্র?

রানী পিসিমা খানিকক্ষণ চুপ কবে বইলেন। রুদ্ধ আবেগে তাঁব সাবা মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। শিশির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর ভাবান্তব লক্ষ্য কবছিল।

রানী পিসিমা চাপা গলায় বললেন,

—না বাবা, তোমাব কাছে স্বীকার কবছি, মুখে যাই-ই বলি না কেন, মনে মনে ঠিক বুঝতে পারি ব্যাপাবগুলোর কোনোটাই নিছক এ্যাক্‌সিডেন্ট্‌ নয়।

—কিন্তু দুজন এ ব্যাপারে সন্দেহের পাত্র হতে পারে। মাত্রই দু'জন, তা আপনি নিঃসন্দেহে জানেন?

—জানি।

—ত্রিদিব আর সরল।

—কিন্তু জানলেও ত মানতে পারি না।

—তবু এই দুজনের মধ্যে, আপনিত ওদের মায়ের মত ভালোবাসেন, ভেবে দেখুন কাকে আপনি সন্দেহ করেন। কিম্বা কাকে আপনি বেশী সন্দেহ করেন?

—না বাবা এরা তোমাদের চোখে সন্দেহের পাত্র হতে পারে, কিন্তু আমার চোখে নয়। আমি সরল ত্রিদিব, এদের কি করে সন্দেহ করি ? ....কিম্বা ধরো এরা ছাড়া যদি আর কেউ, তৃতীয় কেউ ··

—কিন্তু রানী পিসিমা, সুমিতার জীবনের কি কোনো মূল্য নেই আপনার কাছে ? সুমিতা কি আপনার কেউ নয়।

—না, না বাবা। ও কথা বলো না। সুমিতাই ত আমার সব। তোমা-দের কাকাবাবুর ঐ ত একটিমাত্র চিহ্ন। কিন্তু তবু আমি তোমায় বলছি শিশির, আর ভাবনাব কিছু নেই। আর কিছু হয় ত ঘটবে না।

শিশির রানী পিসিমার দিকে ভালো করে তাকিয়ে বলল,

—কেন রানী পিসিমা, আপনি কেন একথা বললেন ? রানী পিসিমা শিশিরের প্রশ্নের কোনো উত্তর দিলেন না।

শিশির আবার প্রশ্ন করেছিল,

—আচ্ছা রানী পিসিমা, আপনার কি মনে হয় ? আপনি কি বিশ্বাস করেন না যে ব্যর্থ প্রেমে মানুষ পাগলের মত হয়ে যায়। সরল আর ত্রিদিব এদের তুজনের মধ্যে কেউ কাণ্ডজ্ঞান হাবিয়েছে। রানী পিসিমা মাথা ঝাঁকিয়ে তুহাতে মুখ ঢেকে বলেছিলেন,

—আমি, কিছু জানিনে ত্রিদিব। আমি ঠিক কিছু ঠাহরই করতে পারছি না।

শিশির চুপ চাপ বসে রানী পিসিমার সঙ্গে এই কথোপকথনগুলি মনের মধ্যে নাড়া-চাড়া করছিল।

তার চমক ভাঙল সরলের উৎফুল্ল কণ্ঠস্বরে।

—কি শিশিরবাবু কি এত ভাবছেন বসে বসে ?

শিশির সরলের দিকে তাকাল। সরলের ঘন আঁকা তুটি ভ্রূ। ভ্রূর তলায় তুটি সুন্দর জিজ্ঞাসু চোখ।

শিশির প্রশ্ন করল,

—আচ্ছা সরলবাবু, আপনাকে একটা প্রশ্ন করব ? অবশ্য প্রশ্নটা খুব

ডেলিকেট্। তবে কিনা আপনি আমাকে আপনার শুভার্থী বন্ধু ভাবেন তাই··· .

সরল হাল্কা গলায় বলল,

—বলুন না স্যর, অত ভূমিকার প্রয়োজন কি? এখন ত আর আপনি খালি ত্রিদিবের বন্ধু নন, আমারও বন্ধু।

—আচ্ছা সরলবাবু রানী পিসিমা কি চান? মানে সুমিতার ব্যাপারে রানী পিসিমা আপনাকে বেশি পছন্দ করেন, না ত্রিদিবকে?

সরল ক্রুদ্ধস্বরে বলল,

—কেন জানি না, ওঁর পছন্দ ত্রিদিবকেই। অথচ কাকাবাবুরও খুব ইচ্ছে ছিল যাতে,···আর তা ছাড়া এ ব্যাপারে কারো ইচ্ছে অনিচ্ছের কোনো মূল্য আছে কি শিশিববাবু। এ ব্যাপারে মনের ওপর কোনো জোর চলে না।

প্রাইভেট্ ট্যাক্সি যখন বাঁশ বাগানের ঝুপ্সি অন্ধকার পেরিয়ে আলো-কোজ্জ্বল রায়বাড়ির সামনে পৌছোল তখন নহবৎ বাজছে। প্রচুর দর্শনার্থীর আনাগোনা। শহর থেকে মূর্তিকার এনে চমৎকার ঠাকুর গড়া হয়েছে। রানী পিসিমা গবদের শাড়ি পরে ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছিলেন। সরল আর শিশির গেটেব কাছে নামল। বানী পিসিমা দূর থেকে লক্ষ্য করলেন বোঝা যাচ্ছিল। সরল পয়সা চুকিয়ে দিতে দিতে শিশিরকে একান্তে বলল,

—রানী পিসিমা কিন্তু আমার কলকাতা যাওয়ার ব্যাপারে একদম খুশি নন। উৎসবের দিন। কিন্তু পূজো প্যাণ্ডেলে বসে সময় কাটানোর মেণ্টা-লিটি কি আর এই বয়সে থাকে শিশিরবাবু বলুন।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে সরল বলল,

—ইস্‌স্ সাড়ে ছ'টা বাজে, সুমিতা হয় ত অপেক্ষা করতে করতে এত-ক্ষণে বের হয়ে গেছে। ওর সঙ্গে আমার দেখা করার কথা ছটায়। চলুন তাড়াতাড়ি ওপরে যাই।

রানী পিসিমার একদম পাশ কাটিয়ে চলে গেল সরল। শিশিরের হাত ধরে ওপরে টেনে নিয়ে চলল সে।

নিজের ঘরের সামনে এসে দরাজা খুলে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সরল। তার পিছনে পিছনে এসে শিশিরও দাঁড়িয়ে পড়ল।

মেঝেতে টকটকে লাল কার্পেটের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে সুস্মিতা। তার চুল খোলা, মাথায় তাজা রক্তের চাপ্ চাপ্ ছাপ, মেঝেতে একটা ভারী ব্রোঞ্জের গ্রীক দেবতার মূর্তি পড়ে আছে। মূর্তিটার গায়েও তাজা রক্ত, শাড়ির আঁচলটা উঠে গেছে মুখের দিকে। সমস্ত পিঠটা খোলা। ব্লাউজের পিছন দিকের বোতামগুলো মাঝে মাঝে ছেঁড়া। পায়ের কাপড়টা খানিকটা উঠে গেছে।

সরল হাতের জিনিষপত্র নামিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি সিঁড়ির মুখের কাছে গিয়ে চিৎকার করতে গেল,

—রানী পিসিমা, রানী পিসিমা!

রানী পিসিমা ওদের পিছন পিছন এসে সিঁড়ির মুখেই দাঁড়িয়েছিলেন। শিশির তাড়াতাড়ি উপস্থিত বুদ্ধির তাগিদে সরলের মুখ চেপে ধরে বলল,

—চুপ্। চ্যাচাবেন না। একটা প্যানিক সৃষ্টি হবে। বাড়িতে বাইরের লোকজন প্রচুর।

ইশারায় রানী পিসিমাকে ওপরে ডেকে নিয়ে এল শিশির। বলল,

রানী পিসিমা স্বস্মিতাকে কেউ খুন করে গেছে।

—রানী পিসিমা শূন্য দৃষ্টিতে শিশিরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। অনেকক্ষণ যেন তিনি কিছু আন্দাজই করতে পারলেন না।

শিশির সরলের দিকে ফিরে বলল,

—আপনি বরং আমাকে একটা তালাচাবি দিন। আমি ঘরটায় তালা-চাবি দিয়ে ম্যানেজার বাবুকে নিয়ে থানায় খবর দিয়ে আসি। আর আপনি রানী পিসিমাকে একটু সামলে রাখুন।

সরলের দিকে তাকিয়ে শিশির দেখল অতবড় পুরুষ মানুষটা যেন এক মুহূর্তে কুঁচকে ছোট হয়ে গেছে। তার গাল বেয়ে দর দর করে অশ্রু ঝরে পড়ছে। নিঃশব্দে সরল শিশিরকে একটা ভারি তালা আর চাবি এনে দিল। মিনিট পনেরর মধ্যেই শিশির জিপে করে পুলিশ ইনস্‌-পেক্টরকে এনে ফেলল। থানা রায়বাড়ি থেকে মাত্র সাত আট মিনিটের পথ। তরুণ ইনস্‌পেক্টর সমর ঘোষ আর জন চারেক সেপাই এসে ঢুকতেই গেটের কাছে একটা সাড়া পড়ে গেল। ম্যানেজার বাবু পাকা লোক। তিনি সবাইকে প্রশ্নের উত্তরে বলতে লাগলেন, ওপরে চুরি হয়ে গেছে তাই সমরবাবু এসেছেন তদন্ত করতে। চাকর বাকরকে ওপরে যেতে বারণ করে দেওয়া হল।

ওপরে এসে শিশির দেখল রানী পিসিমা নিজের ঘরে চুপচাপ শুয়ে শুয়ে নিঃশব্দে কাঁদছেন। আর সরল বারান্দায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে। শিশির পকেট থেকে চাবি বের করে দরজা খুলে দিল। তরুণ ইনস্‌পেক্টর ঘোষ ঘরের ভিতরে ঢুকলেন। সুমিতার দেহটার কাছে এসে তিনি সব পরীক্ষা করে দেখলেন। একটু আশ্চর্য হয়ে তিনি রক্তের নমুনা কাগজের ভাঁজে কাঠি করে আলাদা তুলে নিলেন। দেহটা উল্টে ফেলা হ'ল। কণ্ঠরোধ করে মেরেও আততায়ীর আক্রোশ যায় নি। ভেনাসের ভারি মূর্তিটা দিয়ে মাথা মুখ একেবারে থেঁৎলে দেওয়া হয়েছে।

সুমিতার দেহটা নিয়ে যাবার আগে শিশির আস্তে আস্তে রানী পিসিমার কাছে গিয়ে তাঁকে ডাকল। রানী পিসিমা আপনি আসবেন না একবার। সুমিতাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, শেষ বারের মত ওকে একবার দেখবেন না।

শিশিরের বুকের মধ্যে একটা বোবা ব্যথা মোচড় দিয়ে দিয়ে উঠছিল। রানী পিসিমা বিছানা থেকে উঠে ঘরের বাইরে এলেন। শিশিরের কাঁধে ভর দিয়ে দিয়ে সরলের ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন তিনি। ঘরের ভিতরে তাকিয়ে সুমিতার উপুড় করে রাখা দেহটার দিকে তাকিয়ে

তিনি আর কিছুতেই আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না। আচম্‌কা ডুকরে কেঁদে উঠলেন তিনি।

একি? না, না, এ হতে পারে না, এ কিছুতেই হতে পারে না।

শিশির দেখল রানী পিসিমার দেহটা ক্রমশঃ জগদ্দল ভারি হয়ে খসে পড়ছে তার শরীরে। রানী পিসিমা জ্ঞান হারিয়েছেন। ধরাধরি করে তাঁকে, তাঁর ঘরে শুইয়ে দিয়ে এসে শিশির সরলকে বলল বানী পিসিমাব চোখে মুখে জল দিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে।

সরলকে ওপরে রানী পিসিমার কাছে রেখে শিশির আবার সরলেব ঘরের দিকে গেল। ইনস্‌পেক্টর আর সেপাইরা তখন সেস্ট্রচারে মৃত-দেহটি তুলে ফেলেছে। ঢাকা দিয়েছে দেহটিকে শাদা চাদর দিয়ে।

তখনই শিশিরের খেয়াল হ'ল ত্রিদিবকে অনেকক্ষণ দেখতে পায় নি সে। ত্রিদিব কোথায় গেল? সত্যিই ত!

পুলিশ ইনস্‌পেক্টর ঘোষ আর শিশির পাশাপাশি সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছিল। পিছনে কাপড়ে ঢাকা স্ট্রেচার। তখনই নীচেব বড় হল পেরিয়ে অলকা আর ইলা ভিতরে ঢুকে ভয় চকিত দৃষ্টিতে সেই কাপড়ে মোড়া স্ট্রেচারটা দেখে সিঁটিয়ে দাঁড়াল।

অলকা বলল,

—ব্যাপার কি? পুলিশ কেন? শিশিববাবু কি হয়েছে?

কার অসুখ?

ইলা বলল,

—এ্যাকসিডেনট্ না কি?

ওদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে শিশিরই পাল্‌টা প্রশ্ন করল,

—আপনারা কোথায় গিয়েছিলেন? কে কে গিয়েছিলেন? ত্রিদিব কোথায়? নিভা কোথায়?

অলকা আর ইলা একসঙ্গে বিশৃঙ্খলভাবে যা বলল তার সারমর্ম হ'ল, তারা নিভার খবর জানে না। দুপুর থেকেই নিভার ঘরের দরজা

ভেজানো ছিল। তার শরীর খারাপ বলে তারা আর নিভাকে বিরক্ত করে নি। সুমিতা অলকা আর ইলা বেড়াতে বেরিয়েছিল। এদিক ওদিক লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে সাড়ে পাঁচটা নাগাদ সুমিতা বলে যে নীল বাঁধের দিকে তার এক পুরোনো বন্ধুর বাড়ি সে একা দেখা করতে যাবে। বিশেষ কারণে সে নাকি একা যেতে চায়। অলকা আর ইলাকে সঙ্গে নিতে চায় না। অলকা আর ইলাকে ব্যাপারটা সে গোপন রাখতে বলে আর ঘুরে ফিরে একটু দেরী করে রায়বাড়িতে ফিরতে অনুরোধ করে। অলকা আর ইলা তাই সরস্বতীর খালের ধার পর্যন্ত বেড়িয়ে সন্ধ্যে প্রায় পার করে বাড়ি ফিরছে।

শিশির শেষ পর্যন্ত অলকা আর ইলাকে সুমিতার খুনের কথা বলল। ভয়ে ওরা আর ওপরে গেল না। জড়সড় হয়ে নীচের ভয় চকিত ভিড়ের মধ্যেই বসে রইল। ইনস্‌পেক্টর ঘোষ সুমিতার মৃতদেহটা জিপে তুলে শিশিরকে নিয়ে থানায় রেখে দিতে গেলেন। দেহটা কলকাতায় পোস্ট-মর্টেম্ হতে যাবে। ম্যানেজার মশাই আর দুজন সেপাই রইল বাড়ির পাহারায়।

মিনিট পনেরোর মধ্যে ফিরে এসে ইনস্‌পেক্টর ঘোষ আর শিশির নীচের হল ঘরে বসলেন। ওপরের সিঁড়ি দিয়ে সরল নেমে এল।

শিশির সরলের শোক ম্লান মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—কি সরল, রানী পিসিমার জ্ঞান ফিরেছে?

সরল বিস্বাদ কণ্ঠে বলল,

—জানিনে, আমি কোনো চেষ্টা করি নি। আমার কিছু ভালো লাগছে না শিশিরবাবু!

এমনি সময়ে ত্রিদিব দ্রুতপায়ে বাড়ির ভিতর ঢুকল।

—কি ব্যাপার? বাইরে পুলিশ কেন? নিভার খোঁজ পাওয়া গেছে?

শিশির আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল,

—নিভার?

—নিভা, নিভা কি ? নিভার কি কোনো এ্যাক্‌সিডেনট্‌ হয়েছে ?
শিশির আবার প্রশ্ন করল,
—এ্যাক্‌সিডেনট্‌ হঠাৎ নিভার এ্যাক্‌সিডেণ্ট হতে যাবে কেন ?
ত্রিদিব ক্লান্ত শরীরে পাশের একটা সোফায় প্রায় নেতিয়ে পড়ে বলল,
—কেন ? শোনো নি কিছু ? রানী পিসিমা তোমায় কিছু বলেন নি ? নিভা হঠাৎ কি একটা চিঠি লিখে রেখে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। রানী পিসিমা আমাকে তাই খুঁজতে পাঠিয়েছিলেন। আমি স্টেশনে গিয়ে রিক্‌সাওয়ালা ট্যাক্সিওয়ালা সব্বাইকে জিজ্ঞেস করলাম। কাউকে বাকি রাখি নি। কিন্তু কেউ কিছুই বলতে পারলে না। নিভার মত চেহারার কোনো মেয়েকে কেউ কলকাতার ট্রেণে উঠতে দেখে নি। আমি তাই আবার গ্রামের মধ্যে খুঁজতে গিয়েছিলাম।
ইনস্‌পেক্টর ঘোষ অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরে এদের কথোপকথন শুনে সমস্ত ব্যাপারটার একটা আন্দাজ পাবার চেষ্টা করছিলেন। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে তিনি বললেন,
—আচ্ছা মশাই, কি সব ক্রমাগত হেঁয়ালি বকে যাচ্ছেন বলুন ত ? আমি ত কিছুই ধরতে পারছি না। সবাইকে ডাকুন। আমি আমার কর্তব্য সেরে নিয়ে চলে যাই।
শিশির বলল,
—সত্যিই ত, আমরা নিজেদের মধ্যে আজে বাজে কথা বলে আপনাকে খুবই দেরি করিয়ে দিলাম। সরি ইনস্‌পেক্টর। ত্রিদিব যাও চাকর বাকর কর্মচারী সবাইকে ডাকো। আর সরলবাবু আপনি বরং রানী পিসিমার কি হ'ল খোঁজ নিন গিয়ে।
সরল চক্রার্পিতের মত উঠে সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হল।
ত্রিদিবও শিশিরের কথায় যন্ত্রচালিতের মত উঠে বাইরের দরজার দিকে যেতে গিয়েও হঠাৎ ফিরে দাঁড়াল।
—ইনস্‌পেক্টর ঘোষ, দেখুন শিশির ত আমাকে কিছুই বলছে না।

অন্ততঃ আপনি আমাকে দয়া করে বলুন এ বাড়িতে কি হয়েছে ? কি ঘটেছে ?

সমর ঘোষ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ পেশাদারী ভঙ্গিতে বললেন,

—এবাড়ির মালিকের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী সুমিতা রায় খুন হয়েছেন।

ত্রিদিব গলাচেরা চিৎকার করে উঠল,

—সুমিতা খুন হয়েছে ? কোথায় ?

—সরলবাবুর ঘরে !

ত্রিদিব সোজা সিঁড়ির দিকে ছুটল।

ইনস্‌পেক্টর ঘোষ তাড়াতাড়ি এসে ত্রিদিবের ছু' কাঁধ ধরে ফেলে বললেন,

—ওপরে যাবেন না ত্রিদিববাবু। গিয়ে কোনো লাভ নেই। সুমিতা দেবীর বডি রিমুভ্‌ করা হয়ে গেছে।

ত্রিদিব ফিরে এসে সোফার মধ্যে ভেঙে পড়ল আবার।

—আমি সব জানতাম। সব জানতাম ইনস্‌পেক্টর ঘোষ। শিশিরকে বলেছিলাম। রানী পিসিমাকে বলেছিলাম। কেউ আমার কথা সিরিয়াসলি নেয় নি। কেউ না। আমি জানতাম, আমি জানতাম এত সুখ আমার সইবে না। কেন আমি দেরী করে নীল বাঁধে গেলাম !

ইনস্‌পেক্টর ঘোষ বলিষ্ঠ পুরুষ। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিও বলিষ্ঠ আর বাস্তব। তিনি চোখ সরু করে বললেন,

—ওঃ, তা হলে আপনার সঙ্গে সুমিতা দেবীর নীল বাঁধে এপয়েণ্ট্‌-মেণ্ট্‌ ছিল ?

—হ্যাঁ ছিল। আমার সঙ্গে ছিল সন্ধ্যা ছটায়, আর সরলের সঙ্গে সন্ধ্যা সাতটায়।

শিশির ত্রিদিবের কথায় বাধা দিয়ে বলল,

—সন্ধ্যে সাতটায় নয়, সাড়ে ছটায়।

ত্রিদিব বলল,

—না শিশির, তুমি ভুল করছ, আমি সরলের নিজের হাতে লেখা চিঠি দেখেছিলাম সুমিতার বিছানায়। তাতে লেখা ছিল সন্ধ্যে সাতটা।

ত্রিদিব ভেঙেচুরে বসেছিল চুপচাপ্। তারপর জড়িত গলায় বলল,

—আমার দেরি দেখে অপেক্ষা করে করে হতাশ হয়ে সুমিতা নিশ্চয়ই বাড়ি ফিরে এসেছিল। নিশ্চয়ই সরলের ঘরে এ্যাপয়েনট্‌মেনট্ রাখতে গিয়েছিল। তারপর সরল তাকে খুন করেছে।

ইনস্‌পেক্টর ঘোষ বললেন,

—না, ত্রিদিববাবু আপনি যা ভাবছেন তা একেবারেই ভুল। সরলবাবু আর শিশিরবাবু দেউলচাঁপায় ছিলেন না। তাঁরা কলকাতায় গিয়েছিলেন। আর দু'জনে একসঙ্গেই সুমিতা দেবীর মৃতদেহ দেখতে পান। যাক আর সময় ব্যয় করব না। শিশিরবাবু আপনি রানী পিসিমা আর সরল বাবুকে নীচে আসতে বলুন। আমি বাড়ির সবাইএর কাছ থেকে যা যা জানবার মোটামুটি জেনে নিই।

শিশির ওপরের দিকে তাকিয়ে বলল,

—আরে, সত্যিইত·সরল রানী পিসিমাকে নিয়ে নীচে নামছে না কেন? রানী পিসিমার কি এখনও জ্ঞান ফিরল না?

ইনস্‌পেক্টর ঘোষ বললেন,

—আপনি গিয়ে দেখুন না মশাই। আর কতক্ষণ দেরী করাবেন?

শিশির হঠাৎ সচকিত হয়ে দ্রুত ওপরে উঠে গেল। তারপর মিনিট খানেকের মধ্যেই চেঁচিয়ে উঠল,

—সরল মাথায় চোট খেয়ে পড়ে আছে। রানী পিসিমা কোথাও নেই।

সবাই চরম উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

ইনস্‌পেক্টর ঘোষ ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললেন,

—সে কি? আশ্চর্য, মশাই আপনাদের বাড়িতে নীচে নামবার সিঁড়ি কটা?

ত্রিদিব বলল,

—তিনটে। খড়কিরি আর জমাদার নামা ওঠার।

শিশির বিদ্যুৎপৃষ্টের মত শিহরিত হয়ে উঠে হঠাৎ অস্থিরভাবে বলল,

—তার আগে আমাদের এখুনি বেরিয়ে পড়া উচিত ?

—কোথায় ?

শিশির বলল,

—আসুন আমার সঙ্গে।

ইনস্‌পেক্টর ঘোষ একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, .

—কিন্তু তার আগে সরলবাবুর আঘাতটা ··

শিশির বলল,

—ম্যানেজারবাবু দেখবেন খন, আপনি চলুন ইনস্‌পেক্টর ঘোষ। ত্রিদিব তুমি কি আসবে ?

ত্রিদিব নিঃশব্দে শিশিরের পেছু নিল।

শিশির সদর দিয়ে গাড়ি বারান্দা পেরিয়ে সোজা মাঠে নেমে এল। প্রতিমার মণ্ডপের সামনে দর্শনার্থী শুধু নয়—কানাঘুষায় খবর পেয়ে গ্রাম ভর্তি কৌতূহলী জনতা সভয় কৌতূহলে চাপ বেঁধে রয়েছে। শিশির একবার জ্বলজ্বলে সরস্বতী প্রতিমার দিকে তাকাল। এই কটি মাত্র দিনের ব্যবধানে কত কি যে ঘটে গেল। মৃতার কথা ভেবে নিভৃতে অন্ধকারে তার দুচোখ জলে ভরে উঠল।

গেটের কাছে গিয়ে শিশির আর ইনস্‌পেক্টর ঘোষ দারোয়ানকে রানী পিসিমার কথা জিজ্ঞেস করল। প্রশ্ন করে জানা গেল রানী পিসিমা মিমিট কুড়ি আগে বেরিয়ে গিয়েছেন।

ত্রিদিব জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে ইনস্‌পেক্টর ঘোষকে প্রশ্ন করল,

—তাহলে রানী পিসিমা কি আদৌ অজ্ঞান হন নি ?

—কিন্তু কোথায় গেলেন ভদ্রমহিলা ?

ত্রিদিব প্রশ্ন করল,

—স্টেশনে নয় ত ?

শিশির বলল,

—সেই তান্ত্রিকের আখড়ায় ?

—কি জানি ? হয়ত শোকে দুঃখে মাথার ঠিক নেই রানী পিসিমার। কোথায় কোন্ দিকে গেলেন ?

এতক্ষণে শিশির কথা বলল,

—আচ্ছা ত্রিদিব সুমিতার আজ সন্ধ্যেবেলা কোথায় যাওয়ার কথা ছিল ?

—ত্রিদিব বলল,

—নীল বাঁধে।

—রানী পিসিমা জানতেন ?

—হ্যাঁ কাল রাতে সুমিতা যখন আমার ঘরে এসে নীল বাঁধে যাবার কথা বলছিল রানী পিসিমা তখন হঠাৎ ঘরে এসে পড়েছিলেন।

—তোমার সঙ্গে সুমিতার দেখা করার কথা তাহলে রানী পিসিমা জানতেন ?

—হ্যাঁ। তিনি শুনেছিলেন।

নীল বাঁধ দেউলচাঁপা ছাড়িয়ে। নির্জন অনেকখানি সুবিস্তৃত প্রান্তর পেরিয়ে এখানে প্রায় মাইলখানেকের মধ্যে জনবসতি নেই বল্লেই চলে। বাঁধের কনস্ট্রাকশনের কাজ তখনো কিছু কিছু চলছে বলে দূরে একসার কুলি ব্যারাক। শীতের রাত। ওদের বারাকে নিভু নিভু আগুন আর কুণ্ডলী পাকানো শাদা ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। বাঁধের কাছাকাছি সব জমি সরকারী। সরস্বতীকে বেঁধেছে নীল বাঁধ। দুপাশের জমি শিগগিরই সেচের জল পাবে। বাঁধটাকে আরো একটা অদ্ভুত পিরামিডের মত লাগছিল। শুধু এখানে ওখানে কতকগুলো ইলেকট্রিকের বাতি ভূতের মত জ্বলছে। জায়গাটা জনশূন্য আর ভুতুড়ে। তার কারণ ওই বাঁধের মুখে তারের জালে বোর্ড ঝোলানো শাদার ওপর কালো অক্ষরে লেখা ডেঞ্জার

শব্দটি। জলের খল খল আওয়াজ আর ঢালু থেকে উঁচু হয়ে যাওয়া বাঁধের দেওয়াল। তবে খাঁজকাটা সিঁড়ি আছে। সিঁড়ি বেয়ে ওঠা যায়। আবার ওধারে নীচে বাঁধের দিকে নেমেও যাওয়া যায়। ওখানে চমৎকার বসার জায়গা আছে। কিন্তু ঘোর নির্জনতার জন্যই ওখানে বিশেষ কেউ একা বেড়াতে আসে না।

পুলিশের দুখানা জিপ্ নিঃশব্দে নীল বাঁধের তলায় এসে দাঁড়াল। কোনো শব্দ না করে, কিম্বা টর্চ না জ্বেলে শিশির আর ইনস্পেক্টর ঘোষ নীল বাঁধের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গিয়ে স্তম্ভের পাশে অন্ধকারে মিশিয়ে দাঁড়াল।

নীচে অনেক নীচে জলের ধারে একটা ঝটাপটির শব্দ। শিশির বিদ্যুৎ-বেগে লঘু পায়ে নীচে নেমে গেল। ইনস্পেক্টর ঘোষ নীচে নামতে নামতে শিশিরের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন,

—ওকি, ওকি করছেন রানী পিসিমা, ওকে ছেড়ে দিন,

—না, না, না,

কেমন রুক্ষ আর কর্কশ গলা শুনলেন ইনস্পেক্টর ঘোষ।

—ওকি, ওর কপালটা জলের মধ্যে ধরে ঠুকে ঠুকে একেবারে থেঁৎলে দিলেন যে! না না ছেড়ে দিন ওকে।

—না, কিছুতেই না, অনেকদিন থেকে রাগ পুষে রেখেছি আমি। আজ আর সুযোগ ছাড়ছিনে। ও আমার পরম শত্রুর মেয়ে, যে আমার সমস্ত জীবন নষ্ট করেছিল আর আমার জীবন নষ্ট করেও তৃপ্তি হয় নি ওর, এখন ও…না না, ওকে মরতেই হবে। অন্ধকারে আবার দুটি ছায়ামূর্তি নড়ে চড়ে উঠতে লাগল। তাদের মধ্যে একটি ভারি ধরনের মহিলা শরীর, অচেতন একটি মূর্তির মাথা চুলের ঝুঁটি ধরে তুলে ধরেছে পাথরে ঠুকে চূর্ণ করার জন্য। অন্যজন তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করছে। এতক্ষণে বাঁধের চূড়ায় উজ্জ্বল বিদ্যুতের ফ্লাড্ আলো জ্বলে উঠতেই সিঁড়ির তলার একাংশ আলোকিত হয়ে উঠল। একদল পুলিশ নেমে

আসতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে। রানী পিসিমা বাঁধের জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তবে বেশিদূর যেতে পারলেন না। শিশিরের পাঞ্জাবি তাঁর নখের আগায় ফালা ফালা হয়ে গিয়েছিল। সেই অবস্থায় সে জলে আধডোবা অবস্থায় একটি অচেতন নারীদেহকে তুলে নেবার চেষ্টা করতে লাগল।

ইনস্‌পেক্টর ঘোষ দেহটির কাছে নেমে এসে সবিস্ময়ে বলে উঠলেন এ কি?

বলবারই কথা। একটু আগে ঠিক এমনি একটি মাথায় আঘাত লাগা রক্তমাখা চুল দেহ তিনি থানাব মর্গে রেখে এসেছেন। ঠিক অমনি ছিপ্‌ছিপে ফরসা তরুণী। একই রকম লাল পাড় গরদের শাড়ি পরা। লাল পিঠে বোতাম লাগানো ব্লাউজ। এমন কি হাতের লাল কাচের বালা জোড়াটি পর্যন্ত হুবহু এক। শুধু বাড়্‌তির মধ্যে লাল ভ্যানিটি ব্যাগটি সিঁড়ির রানাবের উপর ছিট্‌কে পড়ে আছে।

—ইনিই কি সেই নিভা?

শিশির দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,

—না। সুমিতা। যাঁর মৃতদেহ রায়বাড়িতে সরলের ঘবে পড়েছিল, তিনিই নিভা।

হাঁটুগেড়ে বসে নাকের কাছে হাত বেখে, নাড়ি পরীক্ষা করে ইনস্‌পেক্টব ঘোষ বললেন,

—প্রাণ এখনও আছে। ওঁকে ইমিডিয়েটলি হাসপাতালে রিমুভ করতে হবে। আস্তে আস্তে সুমিতার অচৈতন্য দেহটি ধরাধরি করে নিয়ে নামতে লাগল পুলিশেরা। রানী পিসিমাকেও নিয়ে গেল।

ইনস্‌পেক্টর ঘোষ শিশিরের পাশ দিয়ে নেমে যেতে যেতে বলল,

—আসুন মশাই। খেলা ত শেষ হল, আর ভাঙা মেলায় দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি?

তবু শিশির একা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। সিমেন্টের উঁচু পাড়। ওপরে

আকাশে কুয়াশা মাখা। নীচে ছোট ছোট খেলনার মত দেখা যাচ্ছে পুলিশের দুখানা জিপ্ আর স্টেশন ওয়াগান একটা। হাতে হাতে টর্চ জ্বলছে। টুক্‌রো টুক্‌রো আলো চলে বেড়াচ্ছে জনশূন্য মরুর মত বাঁধানো সমতলে। একটা জিপে পুলিশ প্রহরায় বসে আছেন রানী পিসিমা।

ত্রিদিব নীচে কোথাও কোনো গাড়িতে বসেছিল। সুমিতার দেহটা নামিয়ে নিয়ে আসতে দেখে সে ছুটে নীচে নেমে এল। শিশির অদ্ভুত হেসে আস্তে আস্তে নীচে নামতে লাগল।

ইনস্‌পেক্টর ঘোষ বললেন,

—আপনি একাজ করলেন কেন? মিসেস্ মিত্র?

রানী পিসিমার দিকে সকৌতূহলে তাকিয়ে ছিল শিশির।

একেই বলে লোকচরিত্রের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়। ভদ্রমহিলার মুখে ভূগোল ঠিকই আছে। একদম বদলায় নি। অথচ পরিষ্কার বোঝা যায় মুখোশটা ছিঁড়ে গেছে। কোথায় সে স্নেহস্নিগ্ধ, পরিতৃপ্ত সন্ন্যাসিনী মূর্তি? সেই সর্বংসহা ভঙ্গি আর কোথায় এই ভ্রূকুটি কুটিল, রুক্ষ, ক্রুদ্ধ উদ্ধত চেহারা। শিশির অবাক হয়ে দেখছিল, এমন কি রানী পিসিমার শরীরেও যেন তার চোখে ফুলে ফেঁপে দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। চওড়া কব্জি পেশিবহুল সমর্থ শরীর, ভারিভর্তি বলিষ্ঠ গড়ন সে এর আগে এ ভাবে লক্ষ্য করে দেখে নি।

রানী পিসিমা ইনস্‌পেক্টর ঘোষের কথার কোনো উত্তর না দিয়ে অন্য দিকে মুখ ফেরালেন।

—কৈ কথার উত্তর দিন! সুমিতার বাবা আপনাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন আর তাঁর মেয়েকে আপনি হত্যা করতে যাচ্ছিলেন, ছিঃ!

রানী পিসিমা ইনস্‌পেক্টর ঘোষের দিকে একবার ফিরে তাকিয়ে আবার অবজ্ঞায় মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

ঘণ্টাখানেক নানারকম ভাবে ধস্তাধস্তি করে রানী পিসিমার পেট থেকে একটি শব্দও যখন বের করতে পারা গেল না তখন ইনস্‌পেক্টর ঘোষ ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে সামনের চেয়ারে বসে পড়লেন। শিশির দেখল মাঘ মাসের শীতেও তাঁর কপাল দিয়ে দর্ দর্ করে স্বেদধাবা গড়িয়ে পড়ছে। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর শিশির ইনস্‌পেক্টর ঘোষকে প্রশ্ন করল,

—আচ্ছা সমরবাবু সুমিতা কি বেঁচে আছে?

—মানে?

ঘোষ সচকিত হয়ে তাকাতেই শিশির রানী পিসিমার অলক্ষিতে তাঁকে সঙ্কেত করে দিল।

—নাঃ বাঁচার আশা নেই। কলকাতায় যেতে যেতেই বোধ হয় শেষ হয়ে যাবে।

—নিভার বডি?

—ওই সঙ্গেই আপনাদের ষ্টেশন ওয়াগনে করে পাঠিয়েছি। পোষ্ট-মর্টেম্ হবে?

ওরা দুজনেই লক্ষ্য করল রানী পিসিমা কান খাড়া করে ওদের কথোপকথন শুনছেন। সুমিতা আর বাঁচবে না এই শেখানো কথাটা বলতেই তাঁর চোখ দুটি অদ্ভুত একটা জয়ের আনন্দে জ্বলে উঠল। মাথা ঘুরিয়ে রানী পিসিমা আস্তে আস্তে প্রশ্ন করলেন,

—ত্রিদিব কোথায়?

ইনস্‌পেক্টর ঘোষ বললেন,

—লক্‌আপে।

—কেন?

—নিভার হত্যাকারী সন্দেহে!

শিশির খুব ভালো করে রানী পিসিমার মুখের ভঙ্গি লক্ষ্য করছিল। সে কিছুই ধরতে পারল না। তিনি আস্তে আস্তে আবার যেন গভীর

চিন্তায় ডুবে গেলেন।

খানিকক্ষণ বাদে চা এল। শিশির আর ইনস্‌পেক্টর ঘোষ ধূমায়িত কাপ তুলে নিলেন। এক কাপ রাখা হল রানী পিসিমার পাশে।

আবার মাথা তুললেন রানী পিসিমা। প্রশ্ন করলেন, আর সরল ?

—সরল বাড়িতেই আছে। ওর মাথায় আঘাত লেগেছে। ম্যানেজার বাবু ওর তদারকি করছেন।

শিশির বলল,

—সত্যি ! সরলবাবুব জন্যে কষ্ট হয়,

ইনস্‌পেক্টর ঘোষ বললেন,

—যাক্‌ তাঁর কষ্টের অবসান শেষ পর্যন্ত হয় ত ঘটবে। সুমিতা দেবীকে উনিই ত শেষ পর্যন্ত পাবেন ?

রানী পিসিমা হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে তীব্র কণ্ঠে বললেন, এই যে বললেন, সুমিতা কলকাতা যাবার আগেই মরে যাবে ? ইনস্‌পেক্টর ঘোষ নিজের বেসামাল উক্তি সামলে নিয়ে বললেন,

—যদ্দির কথা ত বলা যায় না। ধরুন যদি দৈবাৎ জীবনীশক্তির জোরে সুমিতা দেবী বেঁচে যান।

--না, কিছুতেই না, সুমিতার সঙ্গে কিছুতেই, কোনো কারণেই সরলের বিয়ে হতে পারে না। হবে না। ইনস্‌পেক্টর ঘোষ আমি স্বীকারোক্তি দেব। তার আগে আমি সরলকে একবার দেখতে চাই। তাকে আমি পছন্দ করিনে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার বিষয় সম্পত্তি সব দিয়ে যেতে চাই। আমার চন্দননগরের বাড়ি, সব। কিন্তু একটি সর্তে। সরল কিছু-তেই সুমিতা বেঁচে থাকলেও তাকে বিয়ে করতে পারবে না। শিশির উঠে দাঁড়িয়ে বলল,

—ইনস্‌পেক্টর ঘোষ আমি বরং সরলকে নিয়ে আসি। আপনি রানী পিসিমার স্বীকারোক্তি লিখে নিন।

রানী পিসিমা আবার ঘুরে তাকালেন। তাঁর চোখ দুটি ধক্‌ ধক্‌ করে

জ্বলছে। শিশির কে, কি আশ্চর্য তিনি শিশিরবাবু বলে সম্বোধন করে বললেন,

—না, এখন আমি কোনো স্বীকারোক্তি দেব না। আমি যা বলব তা সবই সরলের সামনে বলব।

শিশির ইনস্পেক্টর ঘোষের দিকে তাকিয়ে বলল,

—আচ্ছা, আমি তাহলে এখুনি আসছি।

মাথায় ফেট্টি বাঁধা সরল ইনস্পেক্ট ঘোষ আর শিশিরের মাঝখানের একটা আরাম চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছিল। রানী পিসিমা সেদিকে ফিরেও তাকালেন না, গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন,

—আমার নাম রানী চক্রবর্তী। আমি এই গ্রামেরই একজন অত্যন্ত দরিদ্র পুরোহিতের মেয়ে। বাবার নাম ঈশ্বর সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। আমার ওপরে দিদি আছেন। তিনি আমার মুখদর্শন করেন না। পিঠো-পিঠি ভাই আছে রতন চক্রবর্তী, সেও আমার মুখ দেখে না।

নিশানাথ রায় কলকাতায় আমাদেরই আশ্রিত ছিলেন। সে সময়ে তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। কিন্তু তিনি আরও সুন্দরী ও ধনী মহিলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। তাই আমাকে এঁটো পাতার মত দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে তাঁর একটুও বাধে না। মনের কষ্টে আমি বাড়ি থেকে চলে গিয়ে রাঁচিতে একটা মিশনারি স্কুলে চাকরি নিই। সেখানেই সারা-জীবন কেটে যায়। তারপরে ফিরে আসি নিশনাথ রায়ের কাছে। এই পর্যন্ত আপনাদের সবারই জানা।

এখন লুকোবনা সুমিতার ওপর আমার এত ঘৃণার কারণ। প্রথমত সুমিতা নিশানাথের মেয়ে দ্বিতীয়তঃ সে একেবারে তার বাবার ছাঁচে গড়া। পুরুষ দেখলেই তার খেলার নেশা জাগত। সরল আর ত্রিদিবকে সেকম নাচিয়েছে।

আর ত্রিদিব। সেও সুযোগ পেয়ে নিভার সর্বনাশ করে বসল। নিভা মেয়েটিকে আমি বড় স্নেহ করতাম। নিজের মেয়ের মত। অমন ভালো মেয়ে আমি খুব কম দেখেছি।

শিশির বাধা দিয়ে বলল,

—হ্যাঁ, আপনি যখন উপহার দিতেন সব সময় নিভা আর সুমিতাকে একরকম কাপড় চোপড় দিতেন, তাই না?

রানী পিসিমা সে কথার উত্তর না দিয়ে বললেন,

—আজ সরল আব শিশিরবাবু যখন কলকাতায়--তখন থেকেই নিভাকে পাওয়া যাচ্ছিল না। আমি ত্রিদিবকে ডেকে নিভার খোঁজ করতে বললাম। ত্রিদিব পাগলেব মত বেবিয়ে গেল। আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছিল ত্রিদিব নিভাকে না খুঁজে বরং নীল বাঁধেই যাবে সুমিতার সঙ্গে এপয়েণ্টমেণ্ট্ রাখতে। কিন্তু যখন সন্ধ্যে হয় হয় আমি আমার ঘর থেকে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনলাম। উঠে দাঁড়িয়ে পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখলাম ত্রিদিব আর নিভা খুব ঘনিষ্ঠভাবে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে। আমি আর বাইরে বেরোলাম না। বরং নিভা ফিরেছে, আর ত্রিদিবের সঙ্গে ওর ভাবসাব হয়ে গেছে দেখে খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়েই ঘরে গিয়ে শুলাম। ওরা দু'জনে সরলের ঘরের দিকে গেল। তারপর আমি বিশেষ কিছু শুনি নি। রায়বাড়ির দেওয়ালগুলো মোটা। সরলের ঘরটা ছিল রায়বাড়ির দোতলার একেবারে শেষ প্রান্তে। শুয়ে শুয়ে শুনলাম ত্রিদিব দ্রুত ছুটে যাচ্ছে। আশ্চর্য হয়ে উঠে বসে দেখলাম ও সামনের সিঁড়ি দিয়ে না নেমে পিছনের ঘোরানো ইটের সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে।

ঘোষ প্রশ্ন করলেন,

—তখন আন্দাজ কটা?

—সন্ধ্যে ছ'টা হবে। মানে তখনও সরল বা শিশিরবাবু কেউই কলকাতা থেকে ফেরে নি।···আমার প্রাণটা কেমন হাঁকপাঁক করে উঠল। আমি

উঠে গিয়ে সরলের ঘরের দরজা খুলে দেখি নিভা উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। তার মাথাটা ছেচা। পাশে সেই ভারি ব্রোঞ্জের মূর্তিটা। আমি আস্তে আস্তে দরজা বন্ধ করে নীচে চলে গেলাম। পূজা মণ্ডপে। তারপর ভগবানেব কাছে প্রার্থনা করতে লাগলাম ত্রিদিব যেন ধরা না পড়ে। তারপর শিশিরবাবু আর সরল এল, তার পরের ঘটনা ত সব আপনারা জানেনেই।

কিন্তু আসল কথাটাই ত আপনি বললেন না! সুমিতাকে হঠাৎ কেন মারতে গেলেন আপনি?

—আমি জানি না। হয় ত চাপা রাগ। সরল আমাকে প্রাণপণ বাধা দিয়েছিল, উপায় না দেখে সরলকেও আমি ঠেলে ফেলে দিয়েছিলাম। হয় ত মাথায় লেগে থাকবে সরলের, আমি জানি না।

তবে একটা কথা খুব পরিষ্কার করে সরলকে বলে যেতে চাই, যে তার পথ থেকে ত্রিদিব সরে গেছে বলে সে যেন সুমিতাকে বিয়ে না কবতে যায়। সে যদি আমাকে রানী পিসিমা বলে এখনও মান্য করে তাহলে কেবলমাত্র এইটুকুই আমি চাইব। রানী পিসিমা নিজের কথা শেষ করে চেয়ারের পিঠে মাথাটি এলিয়ে দিয়ে নীমিলিত চোখে বললেন,

—এবার আমাকে হাজতে টাজতে কোথাও নিয়ে যান। আর আমার এখানে থাকার দরকার নেই।

ইনস্‌পেক্টর ঘোষ স্বীকারোক্তিটা এগিয়ে দিয়ে বললেন,

—তাহলে সই করে দিন। এইটেই আপনার ফাইনাল স্বীকারোক্তি ত, আর কোন অদল বদল হবে না?

রানী পিসিমা দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে বললেন,

না

তারপর দৃঢ়হাতে সই করে দিলেন।

দিন তিনেক পরে শিশির কলকাতা থেকে আবার দেউলচাঁপায় ফিরল।

তার সঙ্গে ইনস্‌পেক্টর ঘোষও ছিলেন। সরল ওদের স্টেশন থেকে রিসিভ করে আনতে গিয়েছিল। তখনও ওর মাথায় একটা ফেট্টি বাঁধা। মুখে গভীর বিষাদের ছায়া পড়েছে। আপাতত সবলের দেউলচাঁপা থেকে বেরোনো বারণ। সুমিতা কেমন আছে, তা বার বার সরলকে টেলিগ্রাম করে জানানো হয়েছে। আপাতত তাতেই সরল খুশি।

ত্রিদিবের কথাই বার বাব মনে পড়ছিল শিশিরের। সে প্রশ্ন করল,

—আপনি কি লক্‌আপে দেখতে গিয়েছিলেন ত্রিদিবকে? কেমন আছে ত্রিদিব?

সরল মাথা নামিয়ে বলল,

—আমি যেতে ভরসা পাই নি শিশিববাবু। আমি বসে বসে শুধু ওদের কথা ভেবেছি। আজ আপনারা এসেছেন, আজ চলুন আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে যাই। রানী পিসিমাকেও দেখে আসি। থানার প্রাঙ্গণে গাড়ি থামিয়ে ওরা তিনজন নেমে পড়ল।

হাতমুখ ধুয়ে খানিকটা সুস্থির হয়ে নিয়ে ইনস্‌পেক্টর ঘোষ জমাদারদের ডেকে জনান্তিকে বললেন; কলকাতা থেকে পবের গাড়িতে আরো যে সব অতিথিরা আসছেন তাঁদের জন্য রায়বাড়িতে যেন থাকার ব্যবস্থা করা হয়।

রানী পিসিমাকে হাজত থেকে থানার বড় ঘরে নিয়ে আসা হ'ল। ওদিকের লক্‌আপ্ থেকে ত্রিদিবকে। ত্রিদিবের চেহারার মধ্যে অদ্ভুত একটা রুক্ষতা এসেছে। কদিনের গজানো দাড়ি, ভাঙা গাল, দিশেহারা দৃষ্টি। তাকে বোধহয় কেউ সুমিতার কুশল সংবাদটাও দেয় নি।

শিশির বলল,

—ত্রিদিব কেমন আছো?

ত্রিদিব বলল,

—দেখলে ত শিশির আমার ভবিষ্যৎবাণী কি রকম অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল ?

শিশির বলল,

— কোথায় অক্ষরে অক্ষরে ফলল বলো,

ত্রিদিব বলল,

—আমি তোমায় বলি নি শিশির যে সরল খুন করবে সুমিতাকে, আর

—কিন্তু সরলবাবু ত কলকাতায় ছিলেন, আর সেই সময় খুন হয়েছে নিভা।

ত্রিদিব বলল,

—আমি ত সেকথাও তোমায় বলেছিলাম, যে আমি কিছুই প্রমাণ করতে পারব না। সে উপায় সরল রাখবে না।

—কিন্তু ত্রিদিব, নিভা ত নিজেই আমাকে সব বলেছিল।

—কি ?

—তুমি জানো পোষ্টমর্টেম্ রিপোর্টে নিভার জরায়ুতে তিনমাসের ভ্রূণ পাওয়া গেছে ?

ত্রিদিব শিউরে উঠল। তার আর বাক্যস্ফুর্তি হল না।

—আর খুন হবার দু'দিন আগে নিভা আমাকে বলেছিল এজন্যে তুমিই দায়ী ত্রিদিব।

ত্রিদিব চুপ্‌চাপ্ বসেছিল। এবার উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়াল। তার মুখ যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গিয়েছে।

—শিশির, খুনের বদনাম সে বরং ভালো ছিল, কিন্তু একি জঘন্য পাপে তুমি আমায় জড়ালে ? ত্রিদিব ফিরে তাকাল রানী পিসিমার দিকে শিশিরের দিকে, সরলের দিকে।

— আপনারা সবাই আমার…

ইনস্‌পেক্টর ঘোষ বললেন,

—ত্রিদিববাবু আপনি শান্ত হয়ে বসুন। আপনার সম্বন্ধে মৃত্যুর দু'দিন

আগে নিভা দেবী যদি একথা বলে যান তাহলে শিশিরবাবুর আর দোষ কি? তা ছাড়া খুনের দিন রানী পিসিমা সচক্ষে আপনাকে সরলের ঘর থেকে বেরোতে দেখেছেন।

—কে? রানী পিসিমা?

—ত্রিদিব যেন বিশ্বাস করতে পারছে না এমনি জিজ্ঞাসু চোখে রানী পিসিমার দিকে তাকাল।

রানী পিসিমা স্থির ঠাণ্ডাচোখে তাকিয়ে বললেন,

—ত্রিদিব আর কোনো কথা না ঢেকে সব বলে দেওয়াই ভালো। আমি আমার স্বীকারোক্তিতে যা স্বচক্ষে দেখেছি, বলে দিয়েছি। এঁরা সব কথা টেনে বের করবেন। জানো ত?

ত্রিদিব বুকফাটা স্বরে বলল,

—রানী পিসিমা আপনি কি বলছেন?

তারপর ভেঙে বসে পড়ল ত্রিদিব।

—না, আর আমার কিছু বলবার নেই। আমি কিছু ভাবতে পারছি না।

শিশির হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল,

—আচ্ছা রানী পিসিমা, আপনার স্বামীর নাম কি ছিল?

রানী পিসিমা চকিতে তাকালেন।

—আমার স্বামী? তাঁকে আবার কোথায় পেলেন? আমি ত কুমারী।

—কুমারী? তাহলে বিপ্লবী সঞ্জীব মিত্র আপনার কে?

রানী পিসিমা যেন ভূত দেখলেন,

—কে? আমি ত তাঁকে চিনতাম না। সরল যখন রায়বাড়িতে থাকতে এল তখন তার কাছেই তাঁর ছবি দেখেছিলাম। গল্প শুনেছিলাম।

—আচ্ছা, তার আগে সরলকে আপনি চিনতেন না?

—না।

—কিন্তু রাঁচিতে যে স্কুলে আপনি চাকরি করতেন সেখানকার পুরোনো বৃদ্ধা মাদার বলছিলেন সরলবাবু আপনার ছেলে!

এবার সরল মাথা তুলে তাকাল। তার দু'চোখে তীব্র ঘৃণার আগুন জ্বলে উঠেছে।

শিশির কোনো উত্তরের অবকাশ না দিয়ে পরপর প্রশ্ন করে যেতে লাগল।

— সঞ্জীব মিত্র সত্যিই আপনার স্বামী নন। আপনি কুমারী ছিলেন। হ্যাঁ সেকথা আমরা জেনেছি!

—সঞ্জীব মিত্র বোমার ঝল্‌সানিতে পুড়ে গিয়ে রাঁচিতে লুকিয়ে ছিলেন। আপনার সঙ্গে ট্রেনে তাঁর দেখা হয়ে যায়।

—আপনার সে সময় একজন স্বামীর বড় প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল তাই না রানী পিসিমা?

—কারণ সরল তখন হবে।

—তাই আপনি সঞ্জীব মিত্রকে আশ্রয় দিয়ে স্বামী খাড়া কবে নিলেন।

রানী পিসিমা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন,

—আপনি কি বলছেন কি?

—সরলের জন্ম সময়, সন তারিখ সব আমার কাছে মজুদ আছে। সরল কলকাতায় জন্মেছিল। হাসপাতালে। আপনি দেউলচাঁপা থেকে কলকাতায় আসেন। সঙ্গে ছিল আপনার ভাই রতন চক্রবর্তী। সে নিজেকে আপনার স্বামী নিশানাথ রায় বলে পরিচয় দেয়। আপনি অস্বীকার করতে পারেন?

রানী পিসিমা তাঁর ক্রুদ্ধ চোখ দু'টি নামিয়ে নরম করে এনে বললেন,

—না, একটি কথাও সত্যি না, সব মিথ্যে কথা। সরল আমার কেউ নয়। আমার ছেলেও নয়। কিন্তু ওর পিতৃপরিচয় থেকে আপনারা ওকে বঞ্চিত করতে পারেন না।

—আমরা ত বঞ্চিত করি নি। বঞ্চিত করেছেন আপনি। শিশির হাসল,

—একটা ছবি ধরিয়ে দিয়েছিলেন ওর হাতে আর ছোটবেলা থেকে ওকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছিলেন যে সঞ্জীব মিত্র ওর বাবা।

ইনস্‌পেক্টর ঘোষ বললেন,
—আর নিভা! নিভা ত সঞ্জীব মিত্ররই মেয়ে, তাই না। তাঁর সঙ্গে যে সাঁওতাল মেয়েটির ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তারই ফল। সরলের জ্ঞান হবার আগেই, অর্থাৎ সঞ্জীব মিত্রকে স্বামী বলে পরিচয় দেবার বছর তিনেকের মধ্যেই তাঁকেও হঠাৎ পরলোকে যেতে হয়। তাঁর দেহ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কোনো প্রমাণও নেই নাহ'লে হয় ত বলা যেত আর্সেনিক পয়জনিংই তাঁর মৃত্যুর কারণ। কারণ বুড়ি মাদারের নাকি মনে আছে যে রানী মিত্রের স্বামী খালি খালি বমি আর পায়খানা করছিলেন। আর রানী তাঁকে সুজি জাতীয় কিছু খাইয়ে যাচ্ছিল।
সরল কেমন দমবন্ধ জানোয়ারের মত ছট্‌ফট্‌ করে উঠল। কত কথা যেন তার ঠোঁট দিয়ে ঠেলে ঠেলে উঠছে, কিন্তু সে কিছুই মুখ ফুটে বলতে পারছিল না।
— শিশির বলল,
—রানী পিসিমা, আপনি ত বুঝতেই পারছেন, আমরা সব খবরাখবর সংগ্রহ করেছি। সুতরাং এনিয়ে আর কোনোরকম ফার্স করে লাভ নেই। আপনাকে পুরো ঘটনাটা আবার প্রথম থেকে মনে করিয়ে দিচ্ছি। নিশানাথের সন্তান আপনার পেটে ছিল বলেই আপনি গ্রাম ছেড়েছিলেন। কলকাতায় আপনার ছেলের জন্ম হয়। ছেলে নিয়ে সিঁদূর পরে আপনি রাঁচি যান। ইতিমধ্যে সঞ্জীব মিত্রের সঙ্গে আপনার ট্রেনে দেখা হয়ে যায়। আপনি স্বামী পুত্র নিয়ে রাঁচিতে মিশনারি স্কুলে চাকুরি করতে এলেন।
শিশির এবার সরলের দিকে তাকাল। সরলের দু'হাত মুঠো হয়ে হয়ে উঠছিল। চোখ দুটি যেন ঘৃণায় আক্রোশে ঠেলে বেরিয়ে আসছিল। সে রানী পিসিমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। রানী পিসিমা কিন্তু সমানেই তাঁর বিমুখ মুখ ফিরিয়ে ছিলেন।
শিশির বলল,

—সরল বাবু, এইজন্যেই সুমিতার সঙ্গে আপনার বিয়ের প্রসঙ্গ উঠলে রানী পিসিমা তেলেবেগুণে জ্বলে উঠতেন। হাজার হোক বোনই ত। সৎ বোন বলতে পারেন। ছোটবেলা থেকে রানী পিসিমা নিশানাথ রায়ের বিরুদ্ধে আপনাকে উত্তেজিত করেছেন। আপনি আর রানী পিসিমা নিশানাথের সমস্ত গতিবিধিরই খোঁজ রাখতেন। পরে নিশানাথের কারখানায় চাকরি করতে যাওয়া, কায়দা করে তাঁর চোখে পড়া, তাঁর বাড়িতে জমিয়ে বসা তারপর সময় সুযোগ বুঝে পুরীতে রানী পিসিমার সংগে তাঁর দেখা হয়ে যাওয়া, তারপর কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে কিভাবে সুমিতার সহচরীর চাকরিতে বহাল করা এই সবটার মধ্যেই যে প্ল্যান ছিল না তা কে বলতে পারে?

সরল হঠাৎ চিৎকার করে উঠল,

—আমার বাবা সঞ্জীব মিত্র, না, আমি কারো কথা বিশ্বাস করিনে। আমার বাবা সঞ্জীব মিত্র, সঞ্জীব মিত্র—

রানী পিসিমা উদ্বিগ্ন চোখে সরলের দিকে তাকালেন।

সরল তখন চেয়ারে এলিয়ে পড়েছে। তার কপালের ক্ষত আবার তাজা রক্তে ভিজে উঠল।

শিশির বলল,

আপনার আর সরলের ছুটি খাঁটি ভালোবাসার স্থল হল নিভা আর সঞ্জীব মিত্র। আপনি সরলের পর নিভাকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। আর সরলও ছিল সঞ্জীব মিত্রের স্মৃতিময়।

কিন্তু রানী পিসিমা মানুষ ভাবে এক আর হয় এক। তাই না? শিশির ইনসপেক্টর ঘোষকে বলল,

—এবার সমস্ত ঘটনাটা প্রথম থেকে বলি। অর্থাৎ সুমিতার প্রথম জীবন নাশের চেষ্টার কথা।

—সরল মাশরুম রান্না, জার্মানীতে শেখে নি। শিখেছিল তার মায়ের কাছে। রানী পিসিমা গল্প করেছিলেন একবার তোমার মনে আছে

ত্রিদিব, ওঁদের গ্রামে বিষাক্ত ছাতু খেয়ে বাগ্দি বৌয়ের মারা যাওয়ার গল্প করেছিলেন তিনি ?

তুমি এখন এই শীতকালেও যদি সরস্বতীর খালের ধারের সেই পোড়ো জঙ্গলে যাও তাহলে যদি ওই বিষাক্ত ছত্রাক নাও দেখতে পাও, সেগুলো হওয়ার প্রচুর চিহ্ন ঠিক দেখতে পাবে। সরল দু'পাউণ্ড ভালো নির্দোষ মাশরুম কিনেছিল নিউমার্কেট থেকে। সেটা সুমিতার সামনে কয়েন ফেলে তেজে দেখিয়ে নেয় এবং রান্না করে একটি বাউলে রাখে। দু পাউণ্ড মাশরুম রান্না করলে এক পাউণ্ড হয়ে যায়। তাহলে তা একটি বাউলেই ধরে যাবে। বাউলের সাইজ আমি সুমিতার কাছ থেকে জেনে নিয়েছিলাম।

তাহলে সরল বাবুর সেই দ্বিতীয় বাউলটি কোথা থেকে এলো ? অর্থাৎ আরো দু পাউণ্ড মাশরুম্ ?

সেদিন খাবার টেবিলে দু'বাউল মাশরুম ছিল কিনা ?

ত্রিদিব আশ্চর্য হয়ে মাথা নাড়ল,

—হ্যাঁ, তাইত ছিল। সত্যিই ত ?

—হ্যাঁ, তুমিও মিথ্যে বলো নি। সুমিতাও না।

—সুমিতা একটা রুপোর কয়েন নিজের ব্যাগ্ থেকে বের করে সরলকে দিয়েছিল্। সেটা ঝক্ঝকে ছিল। আর তুমি দেখেছিলে বিষে পোড়া একটা কালো কয়েন। মায়ের বাপের বাড়ির দেশ থেকে চালান আসা বিষাক্ত মাশরুমের বিষ সম্বন্ধে সিওর হবার জন্য সরল যে কয়েনটি ফেলে টেসট্ করেছিল সেই কালো কয়েনটা সে ভুলে টেবিলে ফেলে গিয়েছিল। অথচ সরল আমার কাছে বার বার বলতে চেয়েছে যে তখন তুমি আর্সেনিক নিয়ে লোহার উপর পরীক্ষা করছ। আর সুমিতার ওপর বিষক্রিয়ার লক্ষণগুলোও ছিল আর্সেনিক পয়জেনিং-এর। সুতরাং তুমি যখন অফিস থেকে ফিরে আসো তখন পকেটের আর্সেনিক, নীচে ফ্রিজে মাশরুমের রান্নাটা দেখতে আসার ছল করে তুমি মিশিয়ে দিয়েছিলে।

তাই বিষাক্ত বাউলের খাবারটা তুমি ছদ্ম রাগ করে খাও নি। সরল আর নিভা নামমাত্র খেয়েছিল আর বাকিটা সবই সুমিতা জিদ করে খেয়েছিল। নির্দোশ মাশরূমটা চাকর বাকর খেয়েছিল। তাদের কিছু হয় নি। সুতরাং সরলের পক্ষে প্রমাণ করা শক্ত ছিল না যে রান্নার পরে আর্সেনিক বা আর কোনো বিষ না মিশিয়ে দিলে, একটি পাত্রের মাশ-রূম বিষাক্ত হ'ল আর একটির মাশরূম ঠিক রইল কি করে ? যাবা রান্না না জানে তারা কি করে এক পাউণ্ড মাশরূমের বান্নার পরিমাণটা কি দাঁড়ায় কি করে জানবে ?

দ্বিতীয় ঘটনা রায়বাড়ির চারতলায় আগুন লাগার। রায়বাড়ির চার-তলায় সুমিতাকে ওঠানোর জন্য সরল আর রানী পিসিমা তাকে পরোক্ষে উত্তেজিত করত। নীচের তলাটা গম্ভীর, থম্‌থমে, বিষাদেব ছায়া জড়ানো নার্সিং হোম থেকে একথা শুনতে শুনতে সুমিতা সরলকে তাড়াতাড়ি করে একটা সিঁড়ি তৈরী করে লাগিয়ে দিতে বলে। পাকা সিঁড়ি পরে হবে ঠিক ছিল। যে কোম্পানি সিঁড়ি তৈরী করেন তাঁরা কাঠের সিঁড়ি বানিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁদের ওপর নির্দেশ ছিল ভিতরটা যত অপল্‌কা-ই হোক্ না কেন, বাইরেটায় যেন এলুমিনিয়ম্ পালিশ দেওয়া থাকে।

সরল বাইরে যাবো বলে বেরিয়েছিল। আসলে ছিল বাড়িরই ভিতর সুমিতাকে নিভা যখন রেডিয়োগ্রামে গান শুনিয়ে যাচ্ছে সরল তখন সবাব অলক্ষ্যে ত্রিদিবের গাড়ির ট্যাঙ্ক থেকে সরানো পেট্রোল ছিটিয়ে ছিটিয়ে আশেপাশের ঘরগুলোর ঝোলানো ভারি ভারি পর্দাগুলো ভিজিয়ে দিচ্ছিল। তাই সুমিতার নাকে পোড়া পেট্রলের গন্ধও লেগেছিল। এই পর্যন্ত করে দিয়ে সরল গাড়িতে কলকাতার বাইরে রওনা হয়ে যায়। আর নিভা, সরল আর রানী পিসিমার শিক্ষা মত, ঠিক সময় বুঝে সুমিতাকে ছেড়ে রেফ্রিজারেটরের সন্দেশের খোঁজে নীচে রওনা হয়ে যায়। সরল সিঁড়িতে পেট্রল ঢালতে ঢালতে নেবে গিয়েছিল। নিভা তলা থেকে সেটাকে ভালো করে ধরিয়ে দেয়।

না হলে রানী পিসিমা সারা ওপর তলা যখন দাউ দাউ করে জ্বলছে আশপাশের বাড়িতে লোক দাঁড়িয়ে গেছে, তখন ঘরের মধ্যে নিঝুম হয়ে কি করছিলেন ?

শিশির বলল,

—রানী পিসিমা, বলুন আপনি তখন একটুও পোড়া গন্ধ পান নি ? প্রথমত সন্ধ্যেবেলা আপনি নাকি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তারপর আবার উঠলেনই যদি ত, আপনার আব ভয়ে বুকে এমন ব্যথা ধবে গেল যে, উঠে হাতের কাছের টেলিফোনটা তুলে একটু ফায়ার ব্রিগেড্‌কে খববও দিতে পারলেন না। আর, সেদিন যদি ত্রিদিব এসে না পৌঁছোত আপনারা তিনজনে মিলে সুমিতাকে দিব্যি জতুগৃহ দাহ করে দিতেন।

রানী পিসিমা তাঁর ক্রুদ্ধ চোখ তু'টি তুলে ইনস্‌পেক্টর ঘোষের দিকে তাকিয়ে বললেন,

—আমি কোনো মিথ্যে প্রশ্ন আর সাজানো অভিযোগের উত্তর দিতে চাইনে। আপনি আমাকে একটু বিশ্রাম করার ব্যবস্থা করে দিন।

ইনস্‌পেক্টর ঘোষ বললেন,

—কিন্তু শিশিরবাবু, যাতে আপনার শেষ পর্যন্ত তাড়াতাড়ি বিশ্রামের ব্যবস্থা করা যায়, আদালতে গিয়ে বেশিবার লোকজনের সামনে না দাঁড়াতে হয় সেই ব্যবস্থাই করছেন। আপনাদের বিষয়ে শিশিরবাবু এবং পুলিশ কতটা জানেন সে বিষয়ে হয় আপনার কোনো ধারনা নেই, নয় আপনি এবং সরলবাবু কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে পুরো লাঞ্ছনাটা লোকচক্ষের সামনে বার বার এনে একটা বিকৃত আনন্দ উপভোগ করতে চান।

দার্জিলিঙের কথাটাই ধরুন না কেন ? কি বলুন শিশিরবাবু, দার্জিলিঙের ঘটনাটা ত এঁদের খানিকটা মনে করিয়ে দেওয়া উচিত।

শিশির বলল,

তাই —অবশ্যই।

—যেমন নিভা আমার কাছে যে ভাবে দার্জিলিঙের দুর্ঘটনার গল্প করেছিল তাতে সন্দেহটা পুরো ত্রিদিবের ওপরই পড়ে। সরল আর সুমিতা যখন জলা পাহাড়ের দিকে বেড়াতে গেল তখন ত্রিদিব রাগে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিল। এই-ই ছিল নিভার গল্প বলার মধ্যেকার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত। প্রথমে বেরোয় সরল আর সুমিতা। তারপর ত্রিদিবের অনিচ্ছার সুযোগ নিয়ে রানী পিসিমা। সবল তখন ছিল না। সে গিয়েছিল প্যাটিস কিনতে। আর বোধ হয় ততদিনে সুমিতার প্রতি তার দুর্বলতা ক্রমশ বেড়ে উঠেছিল। এবার সে বোধ হয় নিজে সুমিতার হত্যাকাণ্ডে যোগ দিতে পারে নি। ভার দিয়েছিল রানী পিসিমাকে। রানী পিসিমা অন্ধকারে কুয়াশায় সুমিতাকে পিছন থেকে ঠেলেও দিয়েছিলেন। প্রায় ঈশ্বর প্রেরিতের মত তখন ত্রিদিব পৌছে না গেলে সুমিতার কপালে সেদিন অপমৃত্যুই লেখা ছিল।

ইনস্পেক্টর ঘোষ বললেন,

—কি সরলবাবু আপনার শিশিরবাবুর গল্পের লজিকে পুরো সায় আছে ?

—সকলের দৃষ্টি গেল সরলের দিকে। সরল এলিয়ে পড়েছে। শূন্য-দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে সামনের শূন্য দেয়ালটার দিকে। রানী পিসি-মার কোনো দিকে দৃষ্টি নেই। কোনো কথায় কান নেই। তিনি আকুল ভাবে তাকিয়ে আছেন সরলের মুখের দিকে। সরলের মুখের রেখায় ভাঙচুরের মধ্যে দিয়েই যেন তাঁর সমস্ত জীবনের ভাঙা-গড়া নির্ভর করছে।

ইনস্পেক্টর ঘোষ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে সরলের মাথার ক্ষতস্থানটি থেকে তাজা রক্তের ধারা চুঁইয়ে পড়তে দেখে শিশিরের দিকে ফিরে বললেন,

—সরলবাবুকে এখুনি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত। রানী পিসিমা হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন,

—আপনারা দয়া করুন, ওকে ছেড়ে দিন, ওকে আর কষ্ট দেবেন না। দেখছেন না, দেখছেন না ওর চোখ মুখ ওর ·· চোখ···মুখ···

শিশির চকিতে একবার রানী পিসিমার দিকে তাকিয়ে মাথা নীচু করে নিল।

তার দুচোখ ছাপিয়ে লজ্জায়, ঘৃণায় জল এল।

একদিন এই রানী পিসিমাকে সে কত শ্রদ্ধা করেছে।

—কথাটা ভাবতেও মনে হ'ল সে নিজে কেমন গুটিয়ে ছোট হয়ে যাচ্ছে।

আজ রায়বাড়ি অনেকদিন পর আলোকোজ্বল। ত্রিদিব ফিরে আসছে। নার্সিংহোম থেকে সুমিতাও ফিরে এসেছে। ওর নিজের ঘরে এখনও ও সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী। কপালে ভারি ব্যাণ্ডেজ। সেলাই এখনও কাঁচা।

অলকা আর ইলা এসেছে সুমিতার অনুরোধে। বিছানায় শুয়ে শুয়েই সুমিতা ঘর সাজানো, রান্নার মেনু সব ওদের বলে দিয়েছে। সব তৈরী এবার ত্রিদিব শিশির আর ইনস্পেক্টর ঘোষ এলেই হয়। ত্রিদিব দেউলচাঁপার হাজত থেকে সোজা চলে আসছে কোলকাতায়।

সুমিতা জানলা দিয়ে বাইরে বাগানে তাকিয়েছিল।

অলকা বলল,

—সরলদাকে তাহলে কি ওরা মেণ্টাল হোমে দিচ্ছে ?

ইলা বলল,

—আর রানী পিসিমার কি সত্যিই ফাঁসী হবে ?

সুমিতা ক্লান্ত কণ্ঠে বলল,

—আমি ভাবতেই পারছি না যে রানী পিসিমা কি করে নিভাকে খুন করতে পারলেন, সত্যি।

নীচে গাড়ির আওয়াজ হ'ল।

অলকা আর ইলা ছুটে গিয়ে ওপরের আলোকিত গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেখান থেকেই সমস্বরে চিৎকার করতে লাগল,

—সুমিতা ওঁরা এসে গেছেন।

সুমিতা বালিশের স্তূপে অল্প একটু এলিয়ে পড়ে বলল,

—কপালটার জন্য খুব খারাপ লাগছে দেখতে। দাগটা চিরকালের মত থেকে গেল কিন্তু!

—অলকা আর ইলা ফিরে এসে সুমিতার বিছানায় উল্টোদিকে নরম ডিভানে ছড়ানো কুশণগুলো ঠিক্ ঠাক্ করে রাখল।

সিঁড়িতে মশ্ মশ্ জুতোর শব্দ তুলে শিশিরেরা এসে গেল।

সুমিতা ত্রিদিবকে দেখছিল। ত্রিদিবও সুমিতার ব্যাণ্ডেজের দিকে তাকিয়ে বিষাদমাখা চোখ দুটি নামিয়ে নিল।

সুমিতা এবার খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল,

শিশির চকিতে সুমিতার দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারল সুমিতা তার পুরোনো সেই স্ফুর্তিভরা মনটিকে ফিরে পাবার চেষ্টা করছে।

—দেখছেন শিশিরদা, ত্রিদিবকে একেবারে ছিঁচকে চোরের মত দেখাচ্ছে গাল ভেঙে, দাড়ি গজিয়ে একেবারে বিতিকিচ্ছিরি।

শিশির হেসে বলল,

—ত্রিদিব উত্তর দাও,

ত্রিদিব বলল,

—নাঃ আর উত্তর দেব না। উত্তর দেবার কিছু নেই।

আগে রেগে যেতাম, ভুল বুঝতাম যার জন্য সে'ত আর নেই।

ঘরের সবাই পরস্পরের দিকে তাকাল। সরলের কথা মনে পড়ল সকলের।

শিশির বলল,

—রানী পিসিমা কি জানেন যে সরল আত্মহত্যা করেছে?

ইনস্‌পেক্টর ঘোষ বললেন,

—আপনাদের রানী পিসিমা ত জানা অজানার বাইরে। তিনি পূর্ণ উন্মাদ। ভালোই হয়েছে। কারণ সরলকে যে শেষ পর্যন্ত ধরে ফেলা

যাবে তা রানী পিসিমা ধারণাই করতে পারেন নি। তিনি নিভার খুনের দায়টা নিজের কাঁধেই তুলে নিয়েছিলেন তাঁর দ্বিতীয় স্টেটমেণ্টে। সুমিতা অলকা আর ইলা তিনজনেই আগ্রহ ভরে তাকিয়েছিল ইনস্‌-পেক্টর ঘোষের দিকে।

—সুমিতা ক্লান্ত কণ্ঠে বলল,

—নার্সিংহোমে শুয়ে শুয়ে সব যেন ছায়া ছায়া দেখতাম। কোনো খবর ত আমাকে দেওয়া হ'ত না। এমন কি রোজকার খবরের কাগজও না। আমি কিছুই জানি না শিশিবদা।

শিশির বলল,

অন্ততঃ নিভার খুনের ব্যাপারটা ত একেবারে তুলনাহীন। ঘটনাটা বলি শোনো সুমিতা,

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে শিশির আরম্ভ করল, রানী পিসিমা নিভাকে ভালবাসতেন। রায়বাড়ির বিষয় সম্পত্তি মুঠোয় এনে শেষ পর্যন্ত নিভা আর সরলের বিয়ে দেবেন এই ছিল তাঁর প্ল্যান্। তাই ওদের মেলামেশায় তিনি তেমন বাধা দেন নি। আর তারই সুযোগে নিভা সন্তান সম্ভবা হয়। সন্তান সম্ভবা নিভাকে নিয়ে মা ও ছেলের মন কষাকষি হতে থাকে। কারণ তখন সরলের কাছে নিভার আকর্ষণ ফিকে হয়ে গিয়েছে। সে হাত বাড়িয়েছে সুমিতার দিকে। প্রথম দিকে মা ও নিভার সংগে মিলে সে একদলে ছিল। সুমিতাকে তিনবার হত্যার চেষ্টায় সেও ছিল সামিল। কিন্তু শেষের দিকে তার মনোভাবের পরিবর্তন হয়। সে সুমিতাকে বাঁচাতে চায়, বিয়ে করতে চায়। এ নিয়ে মা ছেলের মধ্যে দারুন মন কষাকষি শুরু হয়েছিল। মাঝে মাঝে কলহও হ'ত। ত্রিদিব তোমার মনে পড়ে একদিন সন্ধ্যায় দেউলচাঁপার খাল-পার থেকে বেড়িয়ে ফিরে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় আমরা রানী পিসিমা আর সরলের কথাকাটাকাটি শুনছিলাম। রানী পিসিমা ত আর সরলকে বলতে পারেন না যে সুমিতা ওর বোন, কারণ ছোটবেলা থেকেই ত ওকে

বুঝিয়ে এসেছেন যে ও তাঁর স্বামী সঞ্জয় মিত্রর একমাত্র সন্তান। তাই তিনি বলছিলেন যে ত্রিদিব সুমিতাকে পাগলের মত ভালবাসে আর তিনি ত্রিদিবকে…

ত্রিদিব বলল,

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার পরিষ্কার মনে আছে রানী পিসিমা বাইরে বেরিয়ে আসতে আসতে বললেন,

—ত্রিদিবকে আমি ভালবাসি !

শিশির বলল,

—না। তিনি তোমায় না দেখে বলেছিলেন ত্রিদিবকে আমি, তারপর তোমায় দেখবার পর একটু থেমে কণ্ঠস্বর বদলে—ভালোবাসি। আসলে তিনি হয়ত বলতে চেয়েছিলেন সুমিতাকে ত্রিদিব পাগলের মত ভালবাসে, আর ত্রিদিবকে আমি ঘৃণা করি। সুতরাং সুমিতাকে রাস্তা থেকে সরাতেই হবে। কিন্তু তোমাকে দেখে ফেলবার পর অসাধারণ উপস্থিত বুদ্ধিতে তিনি কথাটাকে ঘুরিয়ে নেন।

শেষ পর্যন্ত সরল, নিভা আর রানী পিসিমার চাপে পড়ে সুমিতাকে খুন করার নতুন প্ল্যানে যোগ দিতে বাধ্য হয়। কারণ তার উপায়ান্তর ছিল না, এবার নিভার সন্তান সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো হয়। নিভা প্রথমেই আমার মনকে বিষিয়ে দেয় যে তার এই করুণ অবস্থার জন্য ত্রিদিবই দায়ী। ঘটনার দিন ত্রিদিবের সঙ্গে সুমিতা নীলবাঁধে এ্যাপয়েন্টমেণ্ট করে সন্ধ্যে ছ'টায়। সেটা রানী পিসিমা শুনেছিলেন। সরল সুমিতার সঙ্গে এ্যাপয়েন্টমেণ্ট করে তার নিজের ঘরে সন্ধ্যা সাতটায়। আর আমাকে বলে সুমিতার সঙ্গে তার এ্যাপয়েমট্‌মেণ্ট, সন্ধ্যা ছটায়. সুমিতার জন্যে কলকাতায় নেকলেশ্‌ কিনতে যাওয়াটা একটা কারণহীন ছেলেমানুষী উচ্ছ্বাসের মত দেখালেও আসলে সেটা ছিল অত্যন্ত হিসেব করে প্ল্যান করে করা ষড়যন্ত্র যাতে প্রমাণিত হয় যে সুমিতাকে যখন হত্যা করা হয় তখন সরল ছিল ট্রেনে। আমার সঙ্গে।

রানী পিসিমা নিভার সঙ্গে প্ল্যান করে সেদিন সুমিতাকে এমন একটি শাড়ি ব্লাউজ পরতে বলেছিলেন যার হুবহু আর একটি সেট্‌ নিভারও আছে। আসলে নিভা কোথাও যায় নি। সে বাড়িতেই লুকিয়ে ছিল। সন্ধ্যে সাড়ে ছটায় সরল আর আমি যখন ঘরে ঢুকলাম তখন মাটিতে যে দেহটি পড়েছিল সেটি মোটেই মৃতদেহ নয়। নিভার জ্যান্তদেহ। সিঁদুর গোলা আর অন্যান্য রঙ দিয়ে চাপ চাপ রক্ত তৈরী করে তাকে মৃতা সাজিয়ে এমনভাবে মাটিতে উপুড় করে ফেলে রাখা হয়েছিল যাতে তার মুখ দেখা না যায়। যেহেতু সুমিতা আর নিভার দেহগঠন আর বয়স প্রায় একরকম, আমাদের সন্দেহ হবার কথাও নয়। আর সরল সমানে আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছিল সাক্ষী রাখার জন্য। যেন আমি স্বচক্ষে দেখি যে আমি আর সরল কলকাতা থেকে আসার আগেই সুমিতা খুন হয়েছে। সুতরাং খুন সরল করে নি।

ওদের প্ল্যান ছিল, তারপর মৃতদেহ দেখে আমি নিশ্চই বলব দরজায় চাবি দিয়ে পুলিশকে খবর দিতে। চাবিটা অবশ্য সরলেরই চাবি। সুতরাং চাবি খুলে ঘরে ঢুকতেও আর সরলের বাধা নেই। তখন রানী পিসিমা ছদ্ম শোকে অভিভূত হয়ে নিজের ঘরে শুয়ে থাকবেন, আর খিড়কি দিয়ে আসবে সুমিতা তার সন্ধ্যে সাতটার এ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখতে। তখন নিভা উঠে পড়ে সত্যিই পালাবে। কলকাতায় গিয়ে কোনো হোটেলে গা ঢাকা দেবে আর সুমিতাকে সত্যিকারের মৃতদেহ করে শুইয়ে দেবে সরল।

এতক্ষণ সুমিতা মুগ্ধ হয়ে শিশিরের কাহিনী শুনছিল। সে বলল,
—জানেন শিশিরদা ত্রিদিবদার জন্য অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত হয়ে আমি সত্যিই একটা সাইকেল রিক্সা চেপে বাড়ির দিকে রওনা হয়েছিলাম সরলদার সঙ্গে এ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখতে কিন্তু ধরুন ত্রিদিবদা যদি আসত!
শিশির বলল,
—আহাঃ ত্রিদিব যাতে না আসে সে ব্যবস্থা ত আগেই করা হয়েছিল।

না হ'লে নিভা কোথায় চলে গেছে তার খোঁজ করো এই অজুহাতে ত্রিদিবকে নীলবাঁধ যাওয়ার ঘটনা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। যাতে করে বিরক্ত হয়ে, বের হয়ে, রেগে গিয়ে তুমি সবলের সঙ্গে এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট রাখতে আসো।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিভা কি করে সত্যিই....

শিশির হেসে বলল,

—একেই বলে প্যাঁচের ভিতর প্যাঁচ্।

সরল তার শেষ প্যাঁচে তার মা আর নিভার ওপর টেক্কা মারতে চেয়েছিল। সে নিভাকে তার রাস্তা থেকে সরানোর প্ল্যান্ করেছিল। আর ত্রিদিবকে নিভা হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করতে চেয়েছিল। আর শেষ পর্যন্ত এ বিশ্বাস ত তার ছিলই যে নিভাকে হত্যা করলেও, ছেলের প্রাণের মায়ায় তার মাকে ব্যাপাবটা শেষ পর্যন্ত চেপে যেতে হবেই।

তাই আমি যখন ম্যানেজারবাবুকে নিয়ে সরলের ঘবে তালাচাবি দিয়ে, সরলকে বানী পিসিমার শুশ্রূষার জন্য রেখে থানায় যাই, সে তখন ডুপ্লিকেট চাবিতে তালা খুলে সুমিতার জন্য অপেক্ষা না কবে এবার সত্যি সত্যিই নিভাকে হত্যা করে। সেইজন্য ইনস্পেক্টর ঘোষ আসল রক্তের নমুনার সঙ্গে নকল লাল গুঁড়োর মিশ্রন দেখে এত অবাক হয়েছিলেন।

পুলিশ আসার পর সুমিতার দেহ ভেবে নিভার দেহ যখন রিমুভ্ করা হচ্ছে তখন রানী পিসিমাকে ওকে শেষবার দেখতে ডাকা হয়। দেহটা আমিও দেখেছিলাম। তখন আবছা একটা স্মৃতি, একটা অন্য দেহের কোনো চিহ্নের স্মৃতি আমার মনেও এসেছিল। আমি চিন্তাটাকে প্রশ্রয় দেবার অবকাশ পাই নি। বানী পিসিমা মৃতদেহ দেখেই কিন্তু ধরে ফেলেন। এ কি? —করে চিৎকার করে ওঠেন তিনি। কারণ পায়ের কাপড়টা তখনো উঠেছিল। আর গোড়ালী থেকে এক বিঘৎ সেলাই

এর দাগওয়ালা শুক্নো ক্ষতচিহ্নটা তাঁর চোখ এড়ায় নি। তিনি সরলকে কিছু বলেন নি, কিন্তু সুমিতাকে শেষ করবার জন্য যে কোনো মূল্য দিতে প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন নীলবাঁধের দিকে। তাঁর উদ্দেশ্য ঝতে পেরে সরল তাঁকে বাধা দেয়। তিনি সরলের মাথায় আঘাত র তাকে সংজ্ঞাহীন রেখে বেরিয়ে যান। সুমিতার ওপর তাঁর নানা গরণেই তীব্র আক্রোশ জমা হয়ে উঠেছিল। সেই আক্রোশের সীমা াড়িয়েছিল কারণ তাঁদের শেষ ষড়যন্ত্রও বিফল হ'ল বলে। আর রলকে সুমিতার হাতের পুতুল হয়ে গিয়ে নিভাকেও শেষ পর্যন্ত খুন করবে এ তাঁর বুদ্ধিরও অতীত। তাই ছেলেকে সুমিতার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যও তিনি সুমিতাকে খুন করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'ন। কিন্তু সুমিতা তোমার আসতে অত দেরী হ'ল কেন ?

সুমিতা বলল,

—আমি মাত্র একবার নীলবাঁধে গিয়েছিলাম। বাবা বেঁচে থাকতে বছর দু'য়েক আগে। তখনও বাঁধ শেষ হয় নি। পথটাও তেমন চেনা ছিল না ; আর নির্জন বলে ওদিকে যে সাইকেল রিক্সা সচরাচর পাওয়া যায় না তাও জানতাম না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে হাঁটতে হাঁটতে দৈবাৎ একটা রিক্সা পেয়ে যাই। আমি যখন সেটায় চড়ে বাড়ি আসছি, বাড়ির প্রায় মুখেই রানী পিসিমার সঙ্গে দেখা। আমি ভাবলাম আমার জন্য ভেবে ভেবে রানী পিসিমা আমায় খুঁজতে বেরিয়েছেন। তিনি রিক্সা থামিয়ে উঠে এলেন, বললেন, আমার সঙ্গে নাকি তাঁর অনেক কথা আছে। রিক্সা ঘুরিয়ে আবার তাকে নীলবাঁধে নিয়ে যেতে বললেন। রাস্তায় কত কথা কত মিষ্টি মিষ্টি মান অভিমান। এমনকি নীলবাঁধে গিয়েও। তারপর অন্ধকার ধাপ দিয়ে নেমে গিয়েই তাঁর অন্য মূর্তি! সেকি অশ্রাব্য ভাষা, আক্রোশ আর আঘাত....

সুমিতার মুখ আতঙ্কে শাদা হয়ে গেল।

শিশির বলল,

—যাক ওসব অপ্রিয় প্রসঙ্গ আর নয়। অলকা আর ইলা আজ আমাদের কি খাওয়াচ্ছ বলো,

অলকা বলল,

—ডাইনিং রুমে গেলেই দেখতে পাবেন।

শিশির উঠে দাঁড়িয়ে হেসে বলল,

—চলুন ঘোষ মশাই আমরা চারজন অর্থাৎ আপনি আমি অলকা আর ইলা ডাইনিং রুমে যাই। ত্রিদিব এখানে সুমিতায় সংগে নিরিবিলিতে হাজতের বাইরের অন্ন মুখে দিক।

ত্রিদিব সলজ্জ দৃষ্টিতে শিশিরের দিকে তাকাল।

সুমিতা কিন্তু অসঙ্কোচে বলল,

—শিশিরদার প্রত্যেকটা ডিসিসনই এত কারেক্ট্।

—